আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ
রাজা ছত্রপতি
শিবাজী
— পৃষ্ঠা : ২১

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভূ-জ্বর সারাতে
কবিরাজ সূর্য
— পৃষ্ঠা : ২৯

৬৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ১৩ জুন ২০১৬।। ৩০ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

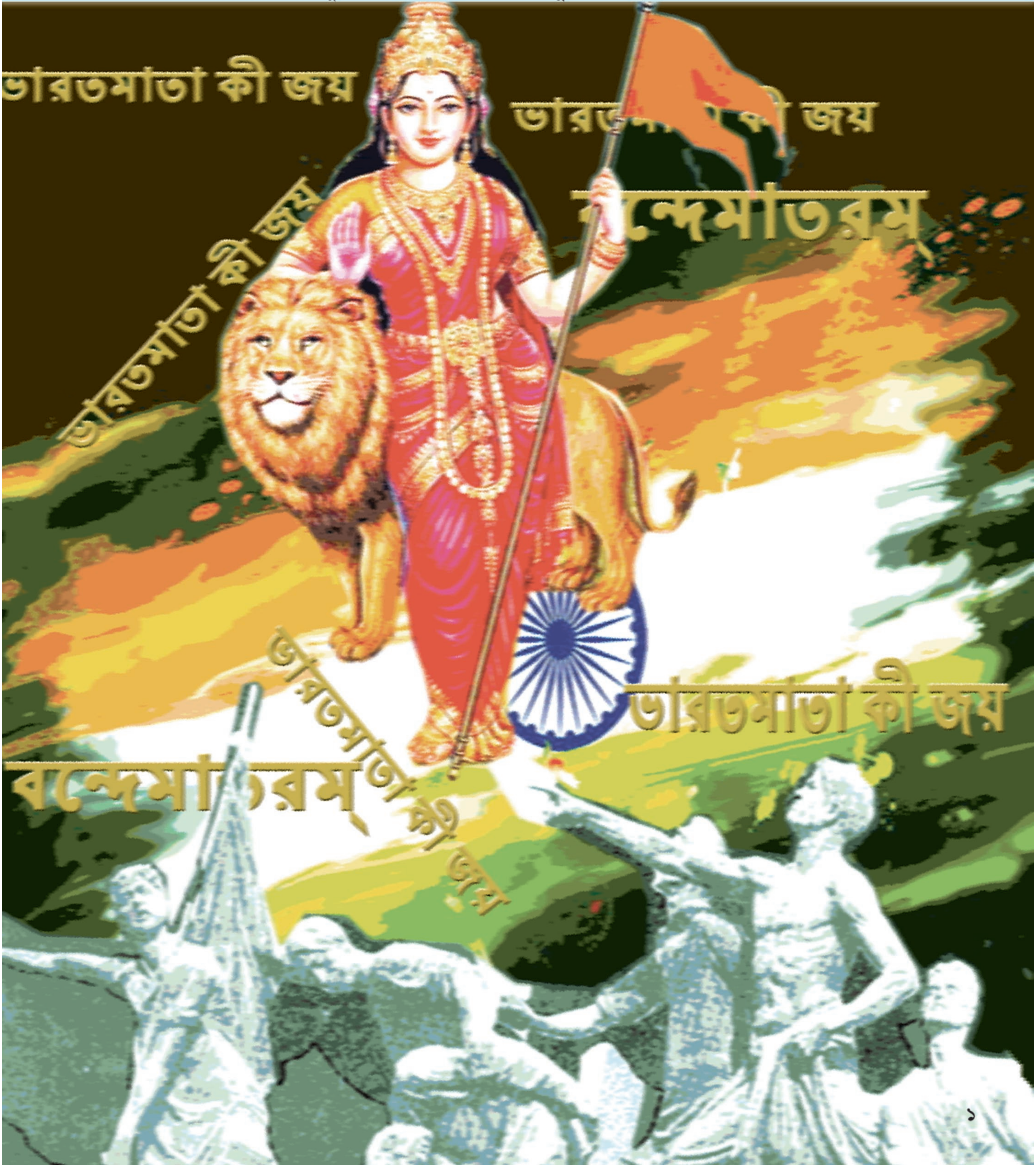

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৩ জুন - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : মদনদা কি দিদির সৎ ভাই?
□ সুন্দর মৌলিক □ ৯

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইটা হবে বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

দেশদ্রোহিতাই এখন প্রগতিশীলতার সেরা মাপকাঠি
□ বরুণ দাস □ ১১

ভারতে থেকে 'ভারতমাতা কী জয়' না বলা গুনাহ্!
□ মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরী □ ১৩

ভারতমাতা কী জয় □ সৌম্যজিৎ মাইতি □ ১৫

বেদকাল থেকে 'ভারতমাতা'
□ সাধু অধ্যাপক ভি রঙ্গরাজন□ ১৭

আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাজা ছত্রপতি শিবাজী
□ কালিদাস বসু □ ২১

শক্তিক্ষেত্র শ্রীলঙ্কা □ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য □ ২২

কংগ্রেস আজ হারানো দিনের গল্প : রাহুল গান্ধীর আঞ্চলিক দলগুলির লেজুড়বৃত্তি করার রাজনীতি লাট খেয়ে পড়েছে
□ এম জে আকবর □ ২৭

ভু-জ্বর সারাতে কবিরাজ 'সূর্য' □ ড. ধনঞ্জয় রায় □ ২৯

বিভাজনের রাজনীতি আজও চলছে □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২৬□ অন্যরকম : ৩৩
সুস্বাস্থ্য: ৩৫ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮
□ রঙ্গম : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২০ জুন, '১৬

প্রকাশিত হবে
২০ জুন, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আর্য আক্রমণের তত্ত্ব একটা গল্প

ভারতীয় স্বাভিমান বোধের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিতে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ইউরোপীয়রা এত বিশ্বাসযোগ্যভাবে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব তৈরি করেছিল যে আমরা দেশবাসীরা তা বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। অথচ যতদিন গিয়েছে দেখা গেছে গোটা ব্যাপারটাই স্ববিরোধিতায় ভরা। এই তত্ত্বের পেছনে এমন কোনো প্রমাণ আজ আর অবশিষ্ট নেই, যেটা ভুল প্রমাণিত হয়নি। বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন প্রবাল চক্রবর্তী।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর আফগানিস্তান সফর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বারবার বিদেশ সফর লইয়া বিরোধী দলগুলি সমালোচনা করিতেছে। তাহাদের বক্তব্য, ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির প্রতি প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট নজর দিতে পারিতেছেন না এবং এই বিদেশ সফরেও তেমন কিছু কাজের কাজ নাকি হইতেছে না। ঘটনা হইল, যাহারা জাগিয়া ঘুমান, তাঁহাদের জাগাইবে কে? প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আফগানিস্তান সফরের কথাই ধরা যাইতে পারে। আফগানিস্তান আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। একদা গান্ধার হিসেবে পরিচিত এই জনপদ অখণ্ড সাংস্কৃতিক ভারতের অঙ্গ ছিল। এই রাজ্যের কন্যা গান্ধারী হস্তিনাপুরে কুরুবংশের রাজবধূরূপে সমাদৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার কথিত 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' বাক্যটি আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের মর্মবাণী। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিও আমাদের দেশের সহিত এই দেশের একটি আন্তরিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে তালিবানদের উত্থানে ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের ফলে এই সম্পর্কের অবনতি হইতে থাকে। তালিবান জঙ্গি গোষ্ঠীকে আফগানিস্তানের ক্ষমতা হইতে সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও এখন অবধি তাহাদের নির্মূল করা যায় নাই। আফগানিস্তানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে মোতায়েন ভারতীয়দের উপর অনেকবার হামলা হইয়াছে। কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস-সহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় কনস্যুলেটেও হামলা হইয়াছে। আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়াছিল পাকিস্তান। আফগানিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আসরফ ঘনি পাকিস্তানের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। এখন অবশ্য তাঁহার নেতৃত্বাধীন আফগান সরকার নিজেদের অবস্থান বদল করিয়াছে। তালিবানের সঙ্গে আফগান সরকারের আলোচনা এখন বন্ধ।

আফগানিস্তানে তালিবান যদি ফের শক্তিশালী হইয়া উঠে তাহা হইলে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। ইহার প্রভাব ভারতের উপরও পড়িবে। তাই ভারতের স্বার্থেই স্থিতিশীল, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়াই অটলবিহারী বাজপেয়ী হইতে মনমোহন সিং-য়ের সরকার পর্যন্ত আফগানিস্তানকে সাহায্য করিবার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। সেই ধারা প্রধানমন্ত্রী মোদীও বজায় রাখিয়াছেন। গত ছয়মাসের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়বার কাবুল সফর করিলেন। আফগান-ভারতের বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে ১৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সালমা বাঁধ গত ৩ জুন মোদী উদ্বোধন করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতের অর্থ সাহায্যে নির্মিত সেই দেশের সংসদ ভবনও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাকিস্তানের খপ্পরে পড়িয়া আফগানিস্তান যাহাতে ভারত বিরোধী না হইয়া উঠে তাহার জন্যই এই প্রচেষ্টা। তবে আশার কথা এই, আফগানিস্তানের বেশিরভাগ মানুষ এখনও ভারতকে বন্ধু হিসাবে গণ্য করিয়া থাকে।

প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের পরই মোদী ভারতের বিদেশ নীতিকে নূতন করিয়া সাজাইবেন বলিয়া স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল—প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ককে এমনভাবে উন্নীত করা যাহাতে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বলয় তৈরি হয় এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন-সহ উন্নত দেশগুলির বিভিন্ন মঞ্চে ভারতের মর্যাদা সুনিশ্চিত হয়। এই দিক হইতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আফগানিস্তান সফর জরুরি। আফগানিস্তানের বর্তমান শাসককুলকে তালিবানদের বিরুদ্ধে জয়ী হইবার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিবার জন্য অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মোদীর আফগানিস্তান সফর গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বিরোধিতা ছাড়া বিরোধীদের এই প্রসঙ্গে সমালোচনার তাই বিশেষ সারবত্তা নাই।

সুভাষিতম্

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ তস্মাৎ ভাবো হি কারণম্।। (চাণক্যনীতি)
দেবতা কাঠেও নেই, পাথরেও নেই, মাটিতেও নেই। দেবতা আছেন অনুভূতির মধ্যে। ভাবই তাঁর সত্তার কারণ।

এন ডি এ-কে কি বাইরে থেকে সমর্থন জানাচ্ছেন জয়ললিতা?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি এদেশের রাজনীতিতে একটি সমীকরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ আই এ ডি এম কে সুপ্রিমো, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা সম্ভবত কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করতে চলেছেন। যদিও উদ্যোগটি একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের কিন্তু বিজেপি নেতৃবর্গ এর সম্ভাব্যতা উড়িয়ে দেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকসভায় এ আই এ ডি এম কে দলের ৩৯ জন এবং রাজ্যসভায় ১২ জন সাংসদ রয়েছেন। সব মিলিয়ে ৫১ জন সাংসদ। জয়ললিতার সমর্থন পেলে প্রস্তাবিত জিএসটি বিল রাজ্যসভায় পাশ করানোর ক্ষেত্রে মোদী সরকার বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এ মাসের শেষ নাগাদ জয়ললিতার দিল্লী যাওয়ার কথা। সম্ভাব্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক। সম্ভবত এই বৈঠকেই জয়ললিতার সঙ্গে এনডিএ জোটের সম্পর্কের রূপরেখাটি চূড়ান্ত হবে। যদিও জয়ললিতার দল যে এনডিএ জোটের শরিক হবে না সেটা এখনই স্পষ্ট। এদিকে এই সমীকরণের

সম্ভাবনায় অনেকেই বিস্মিত। জয়ললিতা বরাবর জোট রাজনীতি এড়িয়ে চলেছেন। এযাবৎ বাম-কংগ্রেস কারও ডাকে কর্ণপাত করেননি। তাহলে এনডিএ কেন? কারণ একটা নয় অনেকগুলো। তবে অন্যতম কারণ অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। অনেকেরই মনে থাকতে পারে পাঁচ বছর আগে নিজের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে জয়ললিতা গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদীও শিষ্টাচার পালন করেছেন। জয়ললিতার অনুগামী এবং দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ নেতা এম থাম্বিদুরাইকে লোকসভার ডেপুটি স্পিকার করে। তবে সুসম্পর্কই একমাত্র কারণ নয়। কংগ্রেস ও বামেরা যে এদেশের আঞ্চলিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে সেকথা জয়ললিতার মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিকের না জানার কথা নয়। এই মুহূর্তে বিজেপি একমাত্র জাতীয় দল। তাছাড়া, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো নেতৃত্বের অভাবজনিত যে সাধারণ সমস্যায় জেরবার, বিজেপি সেই সমস্যা থেকে মুক্ত। নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতা রয়েছে তাদের। সুতরাং জোট করতে হলে বিজেপিই একমাত্র বিকল্প।

যদিও তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে এছাড়া জয়ললিতার আর কোনো উপায় ছিল না। ভোটের বালাই বড়ো বালাই। এবারের নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করতে হলে তাঁর অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাত তাই অভিপ্রেত নয়। এই সমীকরণ সেই সমন্বয়েরই একটি পদক্ষেপ বলে মনে করছেন অনেকে।

যাই হোক, জয়ললিতা যদি বাইরে থেকে এনডিএকে সমর্থন করেন তা হলে সেটা ভালোই। বিল পাশ করার ক্ষেত্রে সুবিধা তো আছেই, তামিলনাড়ুর রাজ্য রাজনীতিতেও এই সমীকরণ যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। তবে কী থেকে কী হবে সেটা সময়ের ব্যাপার। এখনই বলা যুক্তিযুক্ত হবে না।

মুসলমান পুরুষেরাও তালাকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন (বি এম এম এ)-র কর্মীরা তিন তালাক দিয়ে মুসলমান স্ত্রীদের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা রদ করার আন্দোলনে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের তরফে তালাক প্রথা বলবৎ রাখার স্বপক্ষে এক দল মুসলমান মহিলাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলিগড়ে এমপিএলবি-এর তরফে অভিযোগ করা হয়েছে— ভারতীয় মুসলিম মহিলা মোর্চার সদস্যরা মূলত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দালাল।

সূত্র অনুযায়ী সমাজের বহু বিশিষ্ট মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ 'তিন তালাক' বিরোধী এই আন্দোলনে শুধু সমর্থন জানিয়ে নয়— সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করছেন। সাধারণ নাগরিক ছাড়াও চিত্রনাট্যকার অঞ্জুম রাজবলী ও জাভেদ সিদ্দিকীর মতো বিশিষ্টরাও বিএমএমএ-র সমর্থনে বার্তা পাঠিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'মুসলিম ফর সেকুলার ডেমোক্রেসি' নামে যখন একটি সংগঠন তৈরি হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন ঝাড়খণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারহান রহমান নামে এক মহিলা গবেষক। তিনিই প্রথম বার্তা পাঠিয়ে বলেন— ‘‘এই তালাক প্রথা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আমাদের সকলেরই বেরিয়ে এসে এই আন্দোলন সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা উচিত। কেননা তা না করলে একটি মিথ্যে আচারই মান্যতা পেয়ে যাবে আর আমাদের ধর্মেরও হবে ভুল ব্যাখ্যা’’।

গাজিয়াবাদের বাসিন্দা রইস আহমেদ বলেন, তালাক প্রথা চালু রাখার পক্ষে এক বিরাট লবি সক্রিয় রয়েছে। তারা প্রচারও চালাচ্ছে। সুতরাং এর বিরোধিতা করতে হলে আমাদেরও পাল্টা ক্যাম্পেন চালাতে হবে। আমাদেরও লবি প্রয়োজন। এই মর্মে লিখিত এক আবেদনে সই করার পর আহমেদ জানিয়েছেন 'তিন তালাক' প্রথা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরুদ্ধ। এতে মুসলমান মেয়েরা সারাজীবন ভয়ে ভয়ে স্বামীর ঘর করে কেননা যেকোনো মুহূর্তে তাদের তালাক দেওয়া হতে পারে। এই আন্দোলন মঞ্চের সম্পাদক জাভেদ আনন্দ বলেন, প্রগতিশীল অসংখ্য মুসলমান এই প্রথা রদ করার পক্ষে আওয়াজ তুলে আসছেন ২০০৩ সাল থেকে। এই কু-প্রথা ইতিমধ্যেই বিশ্বের ২১টি মুসলমান রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই প্রথা টিকিয়ে রাখা বেমানান। বিক্ষুব্ধ জাভেদ বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী উলেমা তালাককে মান্যতা দিলেও ধর্মীয়ভাবে এটি ইসলাম বিরোধী।

হারিরুদ নদীতে বাঁধ : আফগানিস্তানকে ভারতের মৈত্রী উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সন্ত্রাসবাদীদের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত, রাজনীতির প্যাঁচ, ভৌগোলিক প্রতিকূলতা সব কিছুকে অতিক্রম করে ভারত আফগানিস্তানের পাশে থাকবে বলে সে দেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি আফগানিস্তানের হিরাতে ১৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি নদীবাঁধ ও জলাধারের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। সন্ত্রাসদীর্ণ আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ভারতের নানান উদ্যোগের মধ্যে নদীবাঁধটি অন্যতম।

বাঁধের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সাধ্য কম কিন্তু সাধ অনেক বেশি। আমাদের দুটি দেশের সম্পর্ক আজকের নয়। সন্ত্রাস, ভূগোল বা রাজনীতি যত বাধাই দিক আমরা ঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব।' হিরাতের পশ্চিমে চিস্ত-ই-শেরিফ শহরে হারিরুদ নদীর ওপর নির্মিত বাঁধটির নামকরণ করা হয়েছে ভারত-আফগান মৈত্রী বাঁধ। আশা করা হচ্ছে বাঁধের জলাধারে সঞ্চিত জলে খরাক্লিষ্ট আফগানিস্তানের ৭৫ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে জলসেচ দেওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি ৪২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও সহায়ক হয়ে উঠবে।

দীর্ঘ যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের ফলে আফগানিস্তানের অর্থনীতির এখন বেহাল দশা। সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যুদ্ধ আর সন্ত্রাস আফগান যুবক- যুবতীদের ভবিষ্যত চুরি করে নিয়ে গেছে।' যদিও তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করার জন্য সে দেশের মানুষকে অভিনন্দনও জানান। অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলেন, 'জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে ধ্বংস আর মৃত্যু কখনও জেতে না। মনে হয় জীবন হেরে গেছে কিন্তু সময়মতো ঠিক মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।' আফগানিস্তানের মানুষ যেদিন সর্বার্থে এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে সেদিন পৃথিবী আরও সুন্দর আর নিরাপদ হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কাতারে কাতারে মানুষ হাতে মোদীর ছবি এবং ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কনভয় যত এগিয়েছে হর্ষোল্লাসে ফেটে পড়েছে জনতা। আফগানদের এই আবেগ স্পর্শ করেছিল প্রধানমন্ত্রীকেও। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'এই বাঁধ শুধু ইট দিয়ে তৈরি ভাবলে ভুল হবে। আমরা একে তৈরি করেছি আমাদের বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, প্রেম আর শৌর্য দিয়ে। এমন গর্বের মুহূর্তে আমার মন দুঃখ আর কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ছে সেইসব আফগানদের জন্য, যুদ্ধ আর সন্ত্রাস যাদের কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে আজকের আফগানিস্তানকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক অসাধারণ ভবিষ্যতের সামনে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা ভাবনায় আফগানিস্তানের স্থান এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের দ্বিচারিতা আর চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গত দু' বছরে বেশ কয়েকবার প্রতিবাদ করেছে ভারত। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকেনি সরকার। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা ভিন্ন চীন বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্যের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে ভারত তার প্রতিবেশী বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইরান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনসকে নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে আমেরিকা, উত্তর কোরিয়া, জাপানও চীনের ওপর সন্তুষ্ট নয়। এই অবস্থায় আফগানিস্তানে ভারতের বাঁধ তৈরির উদ্যোগ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি সেখানকার সাধারণ মানুষের প্রবল উচ্ছ্বাসকে ভারতের কূটনৈতিক জয় হিসেবেই দেখছেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা। চীন আর পাকিস্তান যে ক্রমশ চাপে পড়ছে সে বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই।

বচসা থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চন্দ্রকোণায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৮ মে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা রোড এলাকায় টোটো এবং অটো চালকদের মধ্যে বচসার জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। টোটো চালকদের অধিকসংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত। পরস্পর বচসা হাতাহাতি থেকে টোটো চালক ইমতিয়াজ তার দলবল নিয়ে স্ট্যান্ডে অটোচালক অমিত দাসের উপর চড়াও হলে সংঘর্ষ বাঁধে। পরিশেষে লুটপাট এবং দোকানে আগুন লাগানোর মতো ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষে ১৪৪ ধারা জারি হয়। পরেরদিন ২৯ মে টোটোচালক ইমতিয়াজ হাজারখানেক মুসলমান নিয়ে এসে ফের অটোচালকদের উপর হামলা করলে সংঘর্ষের রূপ নেয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গায়ের জোরে হিন্দুদের বাড়িতে আগুন লাগায় ও লুঠপাট চালায়। এতে বেশকিছু লোক জখম হয়। পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করলে তাদের দিকে ইট-পাটকেল ধেয়ে আসে। ফলত তাদের মাথা ফাটে। বিষয়টি নিয়ে হিন্দুদের পক্ষ থেকে পুলিশ বিভাগে নালিশ জানাতে গেলে উলটে তাদের নামে জামিন বহির্ভূত ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। এতে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এর প্রতিবাদ জানায়। চন্দ্রকোণা মানুষের আশা— শাসকদল তথা সরকার এ নিয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে প্রশাসনের চাপে দু'পক্ষই ঘটনাটি মীমাংসা করে নেয়।

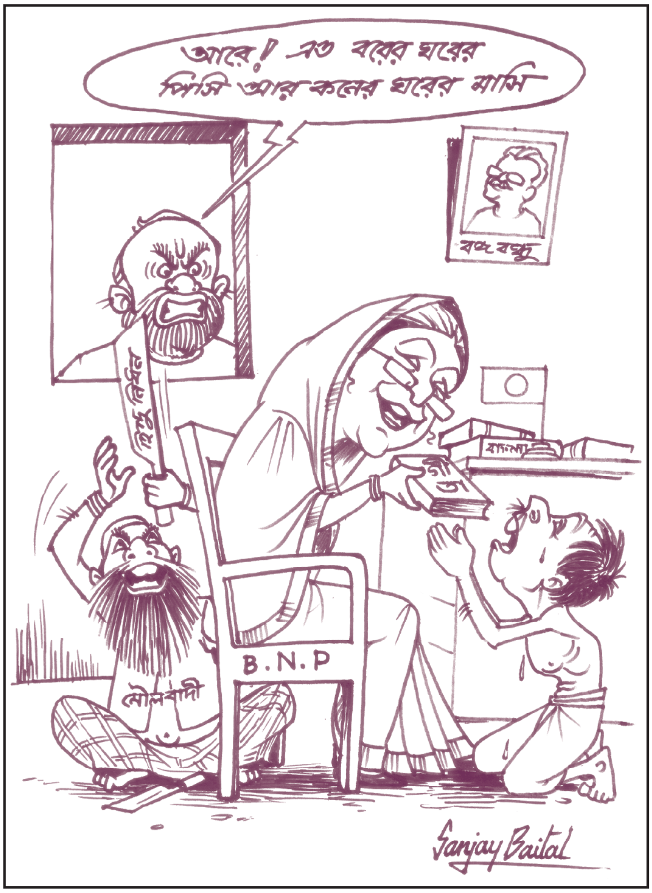

উবাচ

"দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দেশ-জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন ভারতের সমস্ত পুরনো ঐতিহ্য বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে। তিনি বিদেশ থেকে ভাবনা-চিন্তা আমদানি করে, তার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন।"

অমিত শাহ
বিজেপি সভাপতি

পুণাতে এক অনুষ্ঠানে।

"মা যতই ভালো হোক না কেন, বাচ্চাকে মিষ্টি দেওয়া বন্ধ করলেই বাচ্চাটি তার উপর রেগে যায়। আমিও অনেককে মিষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। সেইজন্যেই আমাকে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিরোধীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে।

"বিহার নির্বাচনে ফায়দা তোলার জন্য রোহিতের আত্মহত্যার ঘটনাটি নিয়ে রাহুল রাজনীতি করেছিল। বিহার নির্বাচনের পর রাহুল ও অসহিষ্ণুতা ইস্যু এখন কোথায় গেল?"

থাওয়ার চাঁদ গেহলট
কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও স্বশক্তিকরণ মন্ত্রী

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে।

"নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপের সদস্য হবার ব্যাপারে ভারতকে সাহায্য করতে আমরা (সুইজারল্যান্ড) প্রতিশ্রুতবদ্ধ।"

জোহান স্কেনিডার আম্মান
প্রেসিডেন্ট, সুইজারল্যান্ড

নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে ভারতের অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে।

মদনদা কি দিদির সৎ ভাই?

মাননীয় মদন মিত্র
প্রভাবশালী থেকে অভাবশালী হওয়া
তৃণমূল নেতা
আলিপুর জেল, কলকাতা

দাদা,

এটা দিদির কেমনতর আচরণ? আপনি তো জেলে বসে ভালই মন্ত্রিত্ব চালিয়েছেন। তবে এবার মন্ত্রী করা হলো না কেন? হেরে গিয়েছেন বলে! কিন্তু বাকি যাঁরা হেরেছেন তাঁদের বেলায়? সব হেরো মন্ত্রী হলো মানে মন্ত্রীর মতো হলো, কিন্তু আপনি কেন বাদ গেলেন?

পূর্ব ঘোষণা মতোই কাজ। দলের চারজন প্রাক্তন মন্ত্রী, যাঁরা বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, তাঁদের সরকারি বৃত্তে নিয়ে এসেছেন দিদি মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত, শঙ্কর চক্রবর্তী, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে চারটি দপ্তরের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। চারজনই মন্ত্রীর সমান পদমর্যাদা পাবেন না তবে মণীশ, শঙ্কর ও উপেন্দ্রনাথ পাবেন পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা। চন্দ্রিমা পাবেন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা। প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী মণীশকে বিদ্যুৎ দপ্তরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনে বিদ্যুৎ এবং অপ্রচলিত শক্তি দপ্তর নিয়ে কমিটি গড়া হতে পারে। তার চেয়ারম্যান হিসাবেও মণীশকে নিয়োগ করবে সরকার। কমিটিতে দপ্তরের সচিব তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করবেন।

প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী শঙ্করকে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর মধ্যে একটি সংস্থা পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপেন্দ্রনাথের জন্য তফশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন এবং বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান পদ নির্দিষ্ট রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে তাঁকে অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন এবং বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান করা হচ্ছে। চন্দ্রিমাকে রাজ্য মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা।

আর মদনদা আপনি! সবাই মন্ত্রী হলো আর আপনি জেলেই রইলেন। ব্রাত্য হয়ে। 'প্রভাবশালী' থেকে হয়েছিলেন 'বজরংবলী'! এখন 'অভাবশালী'! সেদিন এস এস কে এমের জরুরি বিভাগ থেকে বেরনোর সময় নিজেকে 'অভাবশালী' বলেই আপনি জ্ঞান হারালেন দেখলাম টিভিতে। মিনিটখানেকের মধ্যেই অবশ্য সুস্থ হয়ে প্রত্যাশিত ফর্মে ফেরেন। নিজেকে তুলনা করেন বিরাট কোহলির সঙ্গে। এই না হলে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী!

আপনি সেদিনই বললেন, ''আমি প্রভাবশালী নই। আমি অভাবশালী। মানুষের সমর্থনের কিছুটা অভাব রয়েছে। অন্যকিছু নয়, আরও মানুষের সমর্থন চাই!'' সেদিন দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কয়েকমাস আগে আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ''আগে ছিলাম প্রভাবশালী। তারপর হলাম বাহুবলী। এখন আমি বজরংবলী।''

আপনার উপরে আস্থা রেখে দিদি আপনাকে প্রার্থী করেছিলেন নাকি কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার জন্য দাঁড় করিয়েছিলেন বলুন তো! আপনি অবশ্য জেলবন্দি হলেও মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা দিদির প্রতি অটুট আস্থা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের শপথ আসলে মমতার দ্বিতীয় ইনিংস। পাঁচ ইনিংস পর্যন্ত খেলবেন মমতা। সেকেন্ড ইনিংসে থামবেন না। এই টেস্ট ম্যাচ চলতেই থাকবে।''

এক সাংবাদিক কূট প্রশ্ন করেছিল, আপনি নিজে প্রথম ইনিংসেই আউট কেন? নিজেকে বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করে মদনদা আপনি বলেছিলেন, ''কোহলিও তো আউট হয়। তা বলে কি সব শেষ হয়ে যায়? খেলা শেষ হয়নি। এ খেলা চলবে নিরন্তর।''

ওসব নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দিদির পুলিশ আপনাকে হারালো কেন? আপনি সেদিন বলেছেন, ''আমার হারের পিছনে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তিনজনের হাত আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সেকথা জানিয়েছি। ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং বেলঘরিয়ার আইসি পরিকল্পনা করে এসব করেছেন। আইসি বেলঘরিয়া বর্ধমান জেলার সিপিএম ক্যাডার। বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের মেরে, আসল ভোটারদের তাড়িয়ে, ভোট দিতে না দিয়ে এঁরা ভোটের হার কমিয়েছেন। কামারহাটিতে ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাস হয়েছে।''

বাকি হেরোদের দিদি মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন ঠিক আছে। আপনাকে দেননি সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু আপনার আনা অভিযোগের উপরে ভিত্তি করে মমতা দিদি পুলিশ অধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন কি?

— **সুন্দর মৌলিক**

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইটা হবে বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের

অসমে যদি হতে পারে তবে তার লাগোয়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে হবে না কেন? ২০১১ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ঝুলিতে ছিল মাত্র পাঁচটি আসন। তার পাঁচবছর পরে ২০১৬ সালে বিজেপি একাই জিতেছে ৬০টি আসন। বিজেপি জোটের আসন ৮৬টি। অসমে শাসন ক্ষমতায় বিজেপি জোট। মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা সর্বানন্দ সোনোয়াল। পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি জিতেছে তিনটি আসন। আর যদি বন্ধু দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে ধরি তবে রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির শক্তি ছয়। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি জোটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে এই রাজ্যে ভবিষ্যতে বিজেপি বা বিজেপি জোটের অভূতপূর্ব উত্থান হবেই। মানুষ কমিউনিস্টদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেস অস্তিত্বহীন। ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণ করবে বিজেপি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইটা হবে বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের।

অসমে, এমনকী বিহারেও, বিজেপি সাম্প্রদায়িক— অচ্ছ্যুত রাজনৈতিক দল নয়। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা বিগত ছয় দশক ধরে লাগাতার অপপ্রচার চালিয়ে জনসঙ্ঘ এবং এখনকার বিজেপির সমর্থকদের হিংস্র, সাম্প্রদায়িক, রামভক্ত হনুমানের দল বলে মগজ ধোলাই করেছে। জনসঙ্ঘের জনক শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যের মানুষ হয়েও আমরা বামপন্থীদের অপপ্রচারের জবাব দিতে পারিনি। আমাদের এই প্রচার-বিমুখতার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ আমি অন্তত খুঁজে পাইনি। আর এস এসের পত্রপত্রিকা ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু সারা দেশে বিজেপির একান্ত নিজস্ব কোনো পত্রপত্রিকা নেই। সত্তরের দশকের প্রথমদিকে দিল্লী থেকে ইংরেজি দৈনিক মাদারল্যান্ড প্রকাশিত হোত। জরুরি অবস্থা চলাকালে ইন্দিরা গান্ধী মাদারল্যান্ড প্রকাশ বন্ধ করে দেন। তারপর বিজেপি অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গড়েছে। বর্তমানে বিজেপির নেতৃত্বেই ভারত সরকার

গূঢ় পুরুষের কলম

চলছে। তবু সারা দেশে মাদারল্যান্ডের মতো দ্বিতীয় একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের জন্ম হলো না। যে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে স্বদেশি, জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী কলমচিরা সমবেতভাবে কমিউনিস্টদের অপপ্রচারের জবাব দিতে পারতেন। বুদ্ধিজীবী লেখকদের সেই ফোরাম বা মঞ্চ আজও তৈরি করতে ব্যর্থ বিজেপি।

স্বস্তিকার ৩০ মে সংখ্যার চিঠিপত্র বিভাগে মাননীয় প্রশান্ত কর বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থেকে তাঁর চিঠিতে যথার্থ আক্ষেপ করেছেন। বলেছেন, 'আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, এবিপি আনন্দ, ২৪ ঘণ্টা ইত্যাদি সংবাদমাধ্যম নিরন্তর বিজেপির বিরুদ্ধে গেয়েই চলেছে। বাস্তবে পশ্চিমবাংলায় বিজেপির প্রচারমাধ্যম প্রায় নেই বলা চলে।' কম খরচে কীভাবে প্রচার চালানো যেতে পারে তার একটা রূপরেখা প্রশান্তবাবু করেও দিয়েছেন। সে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। কারণ, এই রাজ্যে বিজেপি গণসংগঠন কতটা মজবুত তার উপর সাফল্য নির্ভর করছে। তা ছাড়া প্রচারধর্মী হ্যান্ডবিলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। আজকের তরুণ প্রজন্ম ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, টেলিভিশন নির্ভর। প্রচারের ধরনটাও পালটেছে। রাজনৈতিক প্রচার চলে সুকৌশলে নানা প্রযুক্তির সহায়তায়। সোজা কথায়, প্রচারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। এই কাজের জন্য দক্ষ লেখকের দরকার। এখন বেশ কিছু ওয়েবসাইট দৈনিক জনপ্রিয় হয়েছে। এছাড়া সাপ্তাহিক পাক্ষিক পত্রপত্রিকা কয়েক কোটি পাঠক প্রতিদিন ইন্টারনেটে তাঁদের অবসর সময়ে পড়েন। তরুণ প্রজন্মের পাঠকপাঠিকারা তাঁদের মোবাইল ফোনের ইন্টারনেটে দেশদুনিয়ার খবর রাখেন। সংক্ষেপে সুন্দরভাবে পশ্চিমবাংলায় দেশদ্রোহী কার্যকলাপ, অনুপ্রবেশের বিপদ, হিন্দুদের উপর মৌলবাদী আক্রমণ ইত্যাদি ইন্টারনেটের সাহায্যে নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যায়। তবে তার জন্য রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্যোগ গত পাঁচ দশকে আমি দেখিনি। 'জনবার্তা' রাজ্য বিজেপির মুখপত্র। তবে তাকে জনপ্রিয় করার বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়েছে বলে শুনিনি। বর্তমান সময়ে সুন্দর হরফে ছাপা, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, তথ্য সমৃদ্ধ মার্জিত রুচির রচনা পাঠকের মন কাড়ে। প্রয়োজন দক্ষ মার্কেটিং বা প্রচার বিভাগ। কাগজ চলে বিজ্ঞাপনে। দান খয়রাতে নয়। এই রাজ্যে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিজেপি অনুরাগী। বিজ্ঞাপন পেতে এদের সহযোগিতা পেতে হবে। কথাটা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে অসমে একদা অনুপ্রবেশের বিপদ, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা যথাযথভাবে তুলে ধরে দৈনিক যুগশঙ্খ বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আজ অসমে দৈনিক যুগশঙ্খ সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক। এটা অল্প সময়ে হয়নি। জাতীয়তাবাদী দক্ষ কলমবাজ সাংবাদিকদের সংগঠিত করে আজ সে অসমে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। কলকাতায় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন?

শুধু সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিবৃতি দিলে জনসংযোগ হয় না, এই কথাটা যত তাড়াতাড়ি তাঁরা বোঝেন ততই মঙ্গল।

দেশদ্রোহিতাই এখন প্রগতিশীলতার সেরা মাপকাঠি!

বরুণ দাস

ভারত সত্যিই এক বিচিত্র দেশ। বিচিত্র তার মানুষ। বিচিত্র তার চরিত্র। বিচিত্র তার ভাষা। বিচিত্র তার মানসিকতা। বৈচিত্র্যের এমন বহুমুখী ধারা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কবি যথার্থই বলেছিলেন, 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'। কিন্তু 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' কথাগুলি কবির অনুমান ছিল মাত্র। তার মধ্যে বাস্তবতা ছিল না মোটেই। বিবিধের মধ্যে 'মিলন মহান' থাকলে ভারতের এমন করুণ পরিণতি হয় না।

ইতিহাসের পাতা পিছনের দিকে উল্টালে কি দেখি আমরা? দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার আগের আটশো বছর? ওই আটশো বছর কাদের শাসনে ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই কমবেশি জানি, কিন্তু বলতে কেমন যেন দ্বিধাবোধ করি। আমাদের 'শিক্ষিত' ও 'প্রগতিশীল' মন প্রকৃত সত্য উচ্চারণে সায় দেয় না।

কেন সায় দেয় না তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। কেউ কখনও ব্যাখ্যা চাইলে তাকে যে-কোনোভাবে থামিয়ে দেওয়াটাই এদেশের বামপন্থী 'প্রগতিশীল'দের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সহজ ও সত্যি কথাটা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে তাদের এতো দ্বিধা কিংবা ভয় কেন? আসলে এদের ওই আটশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি নেই। ইংরেজদের দুশো বছরের তুলনায় ওই আটশো বছর তারা বোধহয় দুধে-ভাতে পরম সুখে-শান্তিতে ছিল! কিন্তু পুরনো ইতিহাস অন্য কথা বলে।

এ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, তাতে একথা পরিষ্কার যে মধ্যযুগের ইতিহাস পুরোপুরি অবক্ষয় আর অন্ধকারের। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তখন বিলুপ্ত হতে বসেছিল। অপ্রিয় সত্য হলো এই বৃটিশরা এদেশে না এলে সেই অবক্ষয় আর অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে আমাদের আরও কতশত বছর লেগে যেত, তা বলা মুশকিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারা ধরে রাখাই অসম্ভব হয়ে উঠত। এই অপ্রিয় সত্যকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

সুতরাং বৃটিশ শাসনের খারাপ দিক যেমন আছে, তেমনি তার কিছু ইতিবাচক দিকও আছে। বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে তাদের অগ্রণী ভূমিকা প্রশংসনীয়। বৃটিশ সেসময় এদেশে না এলে আমরা আজও অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকতাম। কিন্তু মধ্যযুগের বিদেশি শাসনের কোনো ইতিবাচক দিক নেই। আছে শুধু সভ্যতার পিছু হটা।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে একবার পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় বেশ গর্ব করেই বলেছিলেন যে, তারা (অর্থাৎ মুসলমান শাসকেরা) আটশো বছর হিন্দুদের শাসন করেছেন। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষের ওপর আটশো বছর কর্তৃত্ব করেও সাধ মেটেনি তাদের। প্রয়োজনে পুরো কাশ্মীরের দখল নিতেও পিছপা হবেন না তারা! তাঁর এমন আস্ফালনের সামনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিযুক্ত ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন অসহায়!

এসব তো গেল পুরনোদিনের শ্রুতিকটু ইতিহাস যা 'প্রগতিশীল' বামপন্থীরা সব সময়ই রেখেঢেকে বলতেই পছন্দ করেন। সত্যের খাতিরে কেউ উল্লেখ করলেও তাকে ভুল বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় কোনো খামতি রাখেন না! তাতেও কাজ না হলে তাকে নানারকম তকমা লাগিয়ে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন। অবশেষে নিজের আগমার্কা 'প্রগতিশীলতা' প্রমাণ করার জন্য তাকে ভাজপা কিংবা আর এস এস-এর পাণ্ডা বলে মিথ্যে অপবাদ দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে অভ্যস্ত নই। বরং ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে বাহাদুরি খুঁজি। আমরা আমাদের পছন্দমতো ইতিহাস বানাতে আগ্রহী। দেশের প্রাচীন ইতিহাস বদলে আমরা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছি এবং তাকেই ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। অথচ পি এন ওক-এর মতো কিছু ইতিহাসবিদ যাঁরা নিরপেক্ষভাবে চেষ্টা করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে।

বলাবাহুল্য, ভারতের হিন্দুসমাজের একটি অংশ ভীতু, কাপুরুষ, দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো মানসিক শক্তি তাদের কোনোকালেই ছিল না, এখনও নেই। নাহলে প্রায় হাজার বছর কোনো জাতি বা দেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদেশি শাসনে থাকে! দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ থাকলে কোনোও দেশ বা জাতি আজ না হয় কাল মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই। আসলে এদের তেমন কোনো বোধ বা চেতনাই ছিল না। এখনও যে আছে, তেমন দাবি করাও যায় না।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে মানুষকে নৈতিকভাবে বলীয়ান করে, সঙ্ঘবদ্ধ করে। খৃষ্টান কিংবা মুসলমানরা যেমন ধর্মীয় চেতনা থেকেই বলীয়ান ও সঙ্ঘবদ্ধ— হিন্দুরা কোনোকালেই তেমন ছিল না। হিন্দু ধর্ম আসলে সার্বিক অর্থে বিশেষ কোনো ধর্ম নয়, একটা উদার ও মানবিক দর্শন, যে দর্শন মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে শেখায়। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়গতভাবে কাউকে চিহ্নিত করতে শেখায় না। এখানেই হিন্দু ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য। অন্য ধর্মের সঙ্গে তার স্বতন্ত্রতা।

হিন্দু ধর্মের এই মহানুভবতা ও উদারতাকেই অন্য ধর্মাবলম্বীরা ভারতের হিন্দু সমাজের দুর্বলতা হিসেবে দেখেছে। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা কিংবা সহনশীলতাকে ভেবেছে কাপুরুষতা। ফলে ইংরেজ শাসকরা এদেশে আসার আগে হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছিল বিধর্মীদের নির্মম অত্যাচার, অবাধ লুণ্ঠন, নৃশংস হত্যা, নারীদের ধর্ষণ। অত্যাচারী

বিধর্মী শাসকের আমলে ভারতবর্ষ ও হিন্দু ধর্ম তখন একেবারেই কোণঠাসা। রুখে দাঁড়ানোর মতো শক্তি কিংবা মানসিকতা কোনোটাই ছিল না।

এখনও যে আমরা ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধে বলীয়ান— তেমন দাবি করা যায় না। আর যায় না বলেই স্বাধীনতার উনসত্তর বছর পরেও আমাদের দেশ ও জাতি গভীর সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে। সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত ও বাম-রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সম্প্রদায় 'আন্তর্জাতিকতা'র নামে নিজেদের মাতৃভূমি তথা দেশ ও দশের স্বার্থ বিসর্জন দিতেও পিছপা নয়। তাদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব আজ প্রবল। এরা প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্মের নিন্দা, নিজেদের দেশের সমালোচনা ও জাতীয়তাবাদবিরোধী মতামত ব্যক্ত করতে বিশেষভাবে পারদর্শী। 'প্রগতিশীলতা'র মাপকাঠিই যেন জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা। এরা মুম্বই বিস্ফোরণ, সংসদ আক্রমণ, তাজ হোটেল হানা কিংবা পাঠানকোট-কাণ্ডের পিছনে পাক-চক্রান্ত নয়, 'ভারত সরকারের চক্রান্ত' খুঁজতে বিশেষভাবে তৎপর। তদন্তের ফলাফল বেরনোর আগেই এরা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে নিজেদের 'প্রগতিশীল' চরিত্রের পরিচয় দেন। আজমল কাসভ, আফজল গুরু কিংবা ইয়াকুব মেমনদের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগ নিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী বিরূপ মন্তব্য করেন এবং প্রকাশ্যে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত বিরোধিতা করতেও পিছপা হন না। সংশ্লিষ্ট পাক-অভিযুক্তেরা দোষী প্রমাণিত হয়ে ফাঁসির মতো চরমতম দণ্ড পাওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হন। 'মানবাধিকার'-এর দোহাই দিয়ে অভিযুক্তদের মুক্তি ও শাস্তি রদের সপক্ষে সওয়াল করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারি কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলি এখন জাতীয়তাবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান আখড়া হয়ে উঠেছে। জনগণের কর-এর টাকায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত কম খরচে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা শিকেয় তুলে দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ড ও উগ্র রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। এদের ইন্ধন জোগাচ্ছে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া রাজনৈতিক দলের পাণ্ডারা। দেশ ও দশের স্বার্থের চেয়েও নিজেদের দলের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থই এদের কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে-কোনোভাবে হৈচৈ ফেলে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলকে বিপাকে ফেলা এবং তা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। দেশ উচ্ছন্নে গেলেও এদের কিছু যায় আসে না। কলেজ-ইউনিভার্সিটির কিছু সরলমতি ছাত্রছাত্রীকে উসকে দিয়ে সরকার বিরোধী ইস্যুকে সামনে এনে দলীয় স্বার্থ কায়েম করতে ব্যস্ত। হায়দরাবাদ, দিল্লী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে রেখে দেশের ধান্দাবাজ রাজনীতিকরা এই অনৈতিক কাণ্ডই করে চলেছেন।

উঠতি বয়সে রাজনীতির দিকে ঝোঁক থাকাটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু এ বয়সেই প্রতিবাদী মানসিকতা জন্মায় তাদের মনে। এরা স্বভাবতই গড়ার চেয়ে ভাঙার নেশাতেই উন্মুখ। সুতরাং কোনো বিতর্কিত ইস্যু পেলে সহজেই লুফে নেয় তারা। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে নিজেদের মূল লক্ষ্য বা পঠন-পাঠনের কথাটাই ভুলে যায় তারা। বুঝেই হোক, কিংবা না বুঝেই হোক, নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে পড়ে তারা। হায়দরাবাদের রোহিত ভেমুলা, বিহারের কানাইয়া কুমার, কলকাতার অনির্বাণ ভট্টাচার্য কিংবা কাশ্মীরের খালিদ ওমররা সুষ্ঠুভাবে পড়াশুনা করে নিজেদের পরিবারের পাশাপাশি দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবেন, এটাই আশা করেন তাদের মা-বাবারা। আশা করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচার্য, উপাচার্য কিংবা অধ্যাপকেরাও। বাইরের ভণ্ড রাজনীতিকদের উসকানিতে 'বিপ্লব' করে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট কিংবা বাকি সহপাঠীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার কোনো নৈতিক অধিকার তাদের নেই।

কাশ্মীর-মণিপুর-নাগাল্যাণ্ডের 'আজাদি' দিয়ে যদি কেউ সোচ্চার হতে চান, কিংবা ভারতের বিরুদ্ধে কেউ অন্তর্ঘাত করলে বা ভারতের সংহতি বিনষ্টকারীদের সপক্ষে যদি কেউ লড়াই-আন্দোলন করতে চান তো তিনি বা তারা অবশ্যই কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে করুন। কোনোভাবেই দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘেরাটোপে থেকে নয়। রাজনৈতিক চেতনা আর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্রব কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এ দু'টিকে মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা ছাত্রছাত্রীদের না করাই উচিত।

জনগণের করের টাকায় পরিচালিত কলেজ-ইউনিভার্সিটি বিদ্যাচর্চার স্থান, নেতাগিরি করার স্থান নয়— এই সহজ কথাটি তাদের বুঝতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাইরের নোংরা রাজনীতিকে টেনে এনে যারা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করবে, তারা কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়— একথা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। দেশ ও দশের স্বার্থেই প্রকৃত মেধা ও মগজকে লালন-পালন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এখানে বাধা এলে তা কঠোরভাবেই দমন করা দরকার।

উল্লেখ্য, গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থেই গণতন্ত্রকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কারণ যারা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে অগণতান্ত্রিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে আগ্রহী, প্রয়োজনে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কিছুটা ছেঁটে দিতে হবে। না হলে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নষ্ট হতে বাধ্য। ভারতের মতো উদার গণতন্ত্রে যেটা আকছারই হচ্ছে। উদার গণতন্ত্রের এই অসুখ নিরাময় করতে না পারলে ভারত সঙ্কটের সম্মুখীন হবে নিশ্চিত।

আজ দেশের সামনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তথাকথিত বামপন্থী 'প্রগতিশীল'রা। তাই সরকার অবিলম্বে সচেতন ও সতর্ক না হলে সরলমতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতই অন্ধকার। কড়া হাতে রাশ টেনে না ধরলে ভেঙে পড়বে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও পঠন-পাঠন। নষ্ট হবে উচ্চশিক্ষার যাবতীয় ঐতিহ্য ও উৎকর্ষ। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকদেরও দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে দেশের সংহতি ও স্বাধীনতাই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ভারতে থেকে 'ভারতমাতা কী জয়' না বলা গুনাহ্!

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। যাঁরা এই মন্ত্রপাঠ করেন না, জপ করেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূজারি, যজমান বা সহযোগী নন। ভারতের প্রতি তাঁদের কেবলমাত্র ভোক্তাভাব— চুষে খাওয়া বা শুষে খাওয়ার ভাব থাকতে পারে। মুঘল সম্রাট আকবর অসঙ্কোচে স্বীকার করতেন, এই দেশ হিন্দুস্থান। 'আমি হিন্দুস্থানের বাদশাহ কিন্তু আমি হিন্দু নই।' তাঁর অন্তর্মনের এটাই ছিল স্বীকারোক্তি। বহিরাগতদের ভারতে প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে হিমালয়ের খাইবার পাস অতিক্রম করতে হয়। সেই পর্বতের নাম হিন্দুকুশ। দেশের ভৌগোলিক মানচিত্র বোঝাটাই যে-কোনো নাগরিক বা যে কোনো রাজার অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং সম্রাট আকবরও বুঝে গেলেন যে দেশের পশ্চিমে অপার সমুদ্র, পূর্বেও তাই, দক্ষিণেও তাই। সংস্কৃত ভাষায় সমুদ্রের অপর নাম সিন্ধু। চতুর্দিকে কেবল হিন্দুই (সিন্ধুর অপভ্রংশ) হিন্দু। এই দেশের অধিবাসীরাও হিন্দু। গান্ধার দেশের রাজকন্যা ছিলেন গান্ধারী। কোশলের রাজকন্যা কৌশল্যা। কেকয় দেশের রাজকন্যা কৈকেয়ী। ইংরেজরা বাস করে তাই দেশটার নাম 'ইংল্যান্ড'। ইংল্যান্ডের যে অংশে স্কট সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেই দেশ 'স্কট্ল্যান্ড', জার্মানদের দেশ জার্মানি। এই ভাবে দেখা যায় দেশের অধিবাসীদের পরিচয় অনুসারেই দেশের নাম হয়। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছে। এই দেশের লোক সবাই হিন্দু, তাই বাদশা আক্‌বর দেশটাকে হিন্দুস্থানই বলতেন। জাতি ও ধর্ম এক কথা নয়। ভারতের প্রত্যেক নাগরিক হিন্দুস্থানের পরিচয়ে হিন্দু। প্রাচীনকালেও সকলে একই ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল না। নাস্তিক চার্বাক মতবাদ ছিল। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব ছিল। বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নানা ধর্মমত ছিল। কিন্তু তারা জাতি হিসেবে সবাই ছিলেন হিন্দু। জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু এবং তার পরেও ঔর্ধ্বদৈহিক সংস্কার পর্যন্ত যে ১০টি (মতান্তরে ১৬টি) সংস্কার; তা সকলের মধ্যেই প্রায় সমান। সুতরাং ধর্ম নিয়ে কোনো দলাদলি নেই। গুজরাটে বৈষ্ণব পটেল এবং জৈন পটেলদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ চলে। পঞ্চদেব উপাসকদের মধ্যে বিবাহ নিয়ে কোনো সমস্যা কোনোকালেই ছিল না, এখনও নেই। বর্তমানে যে সব নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে সেই সবই রাজনৈতিক কারণে।

বন্দেমাতরম্-এর উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

সুতরাং উদার দৃষ্টিতে বিচার করলে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকই হিন্দু। এমনকী যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তারাও হিন্দু। ধর্ম ও জাতি এক নয়। যেমন ইংরেজ, জার্মান, ফ্রান্সিস সকলেই একধর্মে বিশ্বাসী নয়। কেউ কেউ ক্যাথোলিক, কেউ প্রোটেস্টান্ট, কেউ অন্য কোনো মতাবলম্বী, কিন্তু জাতি সকলের এক। প্রত্যেক শিশু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃস্তন্য পান করে জীবনধারণ করে। ওই স্তন্য মায়ের ভুক্ত অন্নের পরিণাম। প্রত্যেক প্রাণীই দেশের অন্নজলের দ্বারা প্রতিপালিত। সুতরাং ভারত আমাদের মা। তাই আমরা জয়ধ্বনি দিই--- 'ভারতমাতা কী জয়'।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ সপ্তশতীতে (চণ্ডীতে) শ্লোক আছে— 'স্ত্রীয়াঃ সকলা জগৎসু।' এই জগতের সকল স্ত্রীই আদ্যাশক্তি জগন্মাতা

মুসলমানরা বহু যুগ ধরে ভারতে আছে বলেই তারা ভারতীয় কিনা সেটা তাদেরই জিজ্ঞাসা করতে হবে। তারা যদি ভারতের প্রকৃত নাগরিক হয়ে থাকেন তবে ভারতমাতাকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান করার কোনো প্রয়োজন হোত না। ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন হোত না।

জগদম্বার অংশ। নিজের বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত বাকি সকলকেই মাতৃদৃষ্টিতে দেখতে হবে। হিন্দুরা নিজের কন্যাকেও মা বলে ডাকে। গুজরাটিরা মা-কে 'বা' বলে। পিসিমা, জ্যেঠিমা, বৌমা, এইভাবে প্রায় সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গেই মা শব্দ জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করা হয়। গুজরাটে মেয়েদের

নামের সঙ্গে বেন (মানে বোন) এবং পুরুষদের নামের সঙ্গে ভাই শব্দ জুড়ে ব্যবহার করা হয়। ভাই বোনের সম্বন্ধ পবিত্র। ভাই বোনকে বিয়ে করে না।

ইসলামধর্মে চাচাতুতো ভাই ও বোনের বিয়ে হতে পারে। কিন্তু যদি চাচির স্তন্যপান করে থাকে তবে ওই বিয়ে অবৈধ হবে। দেখা যায় মায়ের দুধকে ইসলামধর্মও মানে। হিন্দুরা গাভীকে গোমাতা বলে। মুসলমানরাও গাভীর দুধ পান করে, আবার মেরে কেটে মাংসও খায়। হিন্দু সংস্কৃতির শিক্ষা সৃষ্টিকে কেউ বদলাতে পারে না। দৃষ্টিকে বদলাও। তবেই সৃষ্টি আর ভোগের স্থান থাকবে না, যোগের স্থানে পরিণত হবে। ভারত হিন্দুদের মাতৃভূমি, পিতৃভূমি, ধর্মভূমি, কর্মভূমি ও মোক্ষভূমি। সুতরাং তাদের তীর্থযাত্রা করতে বিদেশে যেতে হয় না।

পক্ষান্তরে, প্রত্যেক মুসলমান নামাজ পড়েন সৌদি আরবের মক্কার কাবা মসজিদের দিকে মুখ করে। তাঁরা বলেন আল্লা বেহেস্তে থাকেন। কিন্তু প্রণাম মক্কার দিকেই করেন। হিন্দুদের মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত কোনো প্রদেশের বা দেশের ভাষা নয়। সংস্কৃত দেবভাষা। কিন্তু আরবি ভাষা সৌদি আরবের ভাষা। সুতরাং দেখা যায় প্রত্যেক মুসলমান আরবের প্রতি ধর্মীয় দৃষ্টিতে সমর্পিত, ভাষার দৃষ্টিতে সমর্পিত, তারা সকলে খান্ সাহেব হতে ভালবাসেন।

বর্তমানে কিছু কিছু মুসলমান ধর্মগুরু বলতে আরম্ভ করেছেন তারা 'ভারতমাতা কী জয়' কিছুতেই বলবেন না। বললে গুণাহ্ হবে। হিন্দু দৃষ্টিবিন্দু হলো ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের অন্নজল দিয়ে পুষ্ট করে থাকেন। তাই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃবন্দনার কারণগুলি উপস্থিত করেছেন প্রথম কলিতে—

'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।'

আমাকে একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবক বলেছিল— 'সাধুবাবা, আপনি কি জানেন যে গাভীর স্তনে সাদা দুধ হয়ে আসার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত ওই দুধ লাল রক্ত রূপেই থাকত। আপনি যাকে গোরুর দুধ বলছেন সেটা আদতে গোরক্ত'। আমি তাকে বললাম— 'ভাই! দোহনে দেরি হলে গাভীর খুব কষ্ট হয়। সে হাম্বা হাম্বা রবে চিৎকার করতে থাকে। বাছুর যখন দুগ্ধপান করে অথবা যখন গোয়ালা দুগ্ধ দোহন করে তখন গাভীর সুখবোধ হয়, আর কোরবানিতে গলা কেটে রক্তমোক্ষণ করার সময় সে প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ছট্‌ফট্ করে। তবু যদি তুমি দুধ আর রক্ত একই মনে করো, তবে তোমার আম্মাজানের গলা কেটে রক্ত চুষেই দেখতে পারো। ভারতের কিছু কিছু রাজ্যে গোহত্যা বন্ধ থাকলেও বড় বড় বুচরখানা (কসাই খানা) চলছে। চোরা পথে গোমাংস বাংলাদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে।

দেশের অর্থ ভৌগোলিক সীমারেখায় চিহ্নিত ভূখণ্ডটুকুই শুধু নয়, বরং সেই সঙ্গে ওই ভূখণ্ডের অধিবাসী জনগণের অনাদিকালের সংস্কার, সাহিত্য দর্শন শাস্ত্রে। ওই দেশের আহার-বিহার, বেশভূষা, মন্দির নির্মাণ, শিল্পকলা ইত্যাদি সব। যদি কোনো ভারতীয় আর্কিটেকচার কোনো গ্লোবাল মিউজিয়ামে রাখতে হয় তবে জুম্মা মসজিদের ছবি বা মডেল রাখলে চলবে না, কারণ সেটা ইসলামিক মডেল। রাখতে হবে মধ্যপ্রদেশের বৃহদীশ্বর মন্দির বা পুরীর জগন্নাথ মন্দির বা কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরের মডেল।

মুসলমানরা বহু যুগ ধরে ভারতে আছে বলেই তারা ভারতীয় কিনা সেটা তাদেরই জিজ্ঞাসা করতে হবে। তারা যদি ভারতের প্রকৃত নাগরিক হয়ে থাকেন তবে ভারতমাতাকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান করার কোনো প্রয়োজন হোত না। ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন হোত না। সুতরাং ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে আগে মনে প্রাণে হিন্দু হতেই হবে তারপর নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাস। কোরানকে মানবেন কী পুরাণকে মানবেন সে বিষয়ে সকলেই স্বাধীন।

ভারতে বসবাস করব অথচ ভারতের আইন কানুন কিছুই মানব না তা তো চলতে পারে না। রোজার সময় সকল ইসলামিক রাষ্ট্রে খৃষ্টান, ইহুদি, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ সকলের সারাদিন নিয়মমত উপবাস করা কঠোর আইন রয়েছে। সেই আইন লঙ্ঘন করা অপরাধ। হিন্দুস্থানে থেকে ভারতমাতা কী জয় না বলাও ঠিক সেই রকমের দেশদ্রোহিতার অপরাধ। এমন গর্হিত অপরাধ না করাই মঙ্গল। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ভারতমাতা কী জয়

সৌম্যজিৎ মাইতি

'ভারতমাতা কী জয়'— এটি এমন একটি মন্ত্র যা উচ্চারিত হলে একটা সময় সমগ্র ভারতবাসী উদ্বেলিত হোত। পরাধীন ভারতবর্ষে যে মন্ত্র ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আসমুদ্রহিমাচল ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল; সেই মন্ত্র ধর্মনির্বিশেষে 'সর্বস্তরে'র ভারতবাসী বলবে কিনা তা আজ প্রশ্নের মুখে! বাংলা সেই সময়ে ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আঁতুড়ঘর, সেই আঁতুড়ঘরেই জন্মলাভ করা অন্যতম এক 'গর্বিত বাঙালি' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতমাতার রূপদান করেন তুলির সাহায্যে যা সমস্ত ভারতপ্রেমীর মনে অমরত্ব লাভ করেছে। যতদিন ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ভারতমাতৃকার ওই রূপ সকল ভারতপ্রেমীর মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক 'ভারতমাতা' যা প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৭৩ সালে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ১৮৮২ সালে রচিত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত যা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার উৎস— সেগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম 'ভারতমাতা' সম্পর্কে ধারনার জন্ম দেয় পরাধীন ভারতবাসীর মনে। পরাধীন ভারতবর্ষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশকে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করতে থাকেন এবং তাঁদের অন্তরের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত, পোষিত ও লালিত ভারতমাতার চূড়ান্ত রূপ পায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলিতে।

অথচ আজ যখন দুই মহামন্ত্র প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে বারেবারে সমালোচিত তখন বাংলা এবং বাঙালি নীরব। আমরা যারা নিজেদের বাঙালি মনে করে গর্ব অনুভব করি তারা বিস্ময়করভাবে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় সমাজ- ব্যবস্থার মূল সুরটি হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। কবি অতুল প্রসাদ সেন যাকে বলেছিলেন, 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।' সেই ঐক্যের সুরটি হারাতে বসেছে শুধুমাত্র 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বাকস্বাধীনতা' ও 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'— এই তিনটি নীতির ভ্রান্ত প্রয়োগে। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন সেইসব দেশে হয় যেখানে ধর্মগুরুরা দেশশাসনে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করেন। এ দেশে এরকম কখনও হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। সুতরাং ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হয়ে উঠেছে ধর্মহীনতা বা ধর্ম উদাসীনতা। বিশেষ করে হিন্দুদের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সীমাটি ঠিক কোথায়— স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতার পার্থক্যই বা কী— সেকথা কেউ জানে বলে মনে হয় না। এর সঙ্গে রয়েছে বহুত্বের প্রবল প্রচার। ভারত নাকি বহুত্ববাদী দেশ। সর্বৈব মিথ্যা। ভারত বৈচিত্র্যময় দেশ। বিবিধতার দেশ। সেই বিবিধতার মাঝে ঐক্যের মেরুদণ্ড হলো জাতীয়তাবোধ। আর জাতীয়তাবোধেরই দুটি মন্ত্র—'ভারতমাতা কী জয়' এবং 'বন্দেমাতরম্'। মুসলমানরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে চান না। স্বাভাবিক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা নগণ্য। স্বাধীনোত্তর ভারতে তারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির ভোটব্যাঙ্ক। সুতরাং দেশকে উৎসন্নে পাঠিয়ে তারা দরকষাকষি করবেন না তো আর কে করবে?

'দিনকাল বড়ই সর্বনেশে'— এই মুহূর্তে চতুর্দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ভারত-বিদ্বেষী নানা শক্তি, যা ভারতকে আরও

লণ্ডভণ্ড-খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলতে পারে আমাদের সংবিধান প্রদত্ত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'বাকস্বাধীনতা'র হাত ধরে! বর্তমানে বিশেষ একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল যা এক সময় ছিল জাতীয়তাবাদী, এখন যেনতেন প্রকারেণ গদি দখলের জন্য হারিয়ে ফেলেছে জাতীয়তাবাদের কৌলিন্য। কারণ সেই দল এখন 'ধর্মনিরপেক্ষ' দল! তবুও নিজ দেশকে যদি নিতান্ত ভালবেসেই ফেলেন; নিজেদের মনে জাগ্রত দেশপ্রেম দিয়ে দেশমাতৃকার বন্দনা ও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে ভারতমাতার জয়গান করা বা অপরকে দিয়ে করানো থেকে শত হস্ত যোজন দূরে থাকাটা কি বাঞ্ছনীয়? তাই সাধু সাবধান! আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতমাতার বীর শহিদ সেনানীদের ভূমিকা শেখাতে যদি 'ভারতমাতা কী জয়'— এই মন্ত্রের গুরুত্ব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অনুধাবন করাতে না পারি তাহলে যে বিবিধতা নিয়ে আমাদের এই দুনিয়াদারির গর্ব, সেই বিবিধতাই আমাদের ভারতকে এক সময় খণ্ডবিখণ্ড করে দেবে না তা কে হলফ করে বলতে পারে! ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতের যে প্রকৃতির কথা উল্লেখ (সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র) আছে, তা এক কথায় প্রকাশ করতে হলে তা হবে— 'ভারতমাতা কী জয়' কথাটির গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে শেখা ও শেখানো। যে দেশে দীর্ঘকাল ধরে বাস করি, সেই দেশকে ভালোবাসি বলেই তো তাকে মাতৃরূপে বন্দনা করি অন্য সকল দেশবাসীর মতো 'কমন' ভাষায়— এখানে আমার ধর্ম যাই হোক না কেন। কারণ ধর্মের থেকে দেশ আগে, সে আমি যে দেশেই বাস করি না কেন— এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত সভ্যদেশে এটাই দস্তুর। তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে এনে দিয়েছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অপরাপর ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এক অনন্য সুযোগ।

'ধর্মগ্রন্থ' আমাকে কী করতে হবে, কী করতে হবে না তা বলে দিয়েছে সেই সময়ের ও নির্দিষ্ট স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। তারপর কত শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। দুনিয়াটা কি সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটকে আছে? যদি তা না হয়, তবে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে, অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যে জাতীয়তা-সম্পন্ন হয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ- নির্বিশেষে এটাকে হিন্দু মন্ত্র না ভেবে আসমুদ্র হিমাচল গর্জে উঠুক এই বলে— 'ভারতমাতা কী জয়', 'বন্দেমাতরম্'।

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

বেদকাল থেকে 'ভারতমাতা'

সাধু অধ্যাপক ভি রঙ্গরাজন

আজ আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতের কিছু লোক বলছেন প্রাচীন ভারতে 'ভারতমাতা কী জয়' বলার প্রথা ছিল না। যাঁরা বলছেন তাঁরা ইতিহাস জানেন না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত গত ৩ মার্চ বলেছিলেন— এখন সময় এসে গেছে নতুন প্রজন্মকে এটা বলার যেন তারা 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি দেয়। তাঁর এই বক্তব্যের বিষয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বিতর্ক শুরু করে দেন। বিতর্ক এখনও থামেনি। তিনি বক্তব্য স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন— আমাদের এমন মহান ভারত নির্মাণ করতে হবে যেন লোক নিজে থেকেই ভারতমাতার জয়ধ্বনি দেয়। এটা কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হোক। এর জন্য ভারতকে মাতৃভূমি রূপে বুঝতে ও অনুভব করতে হবে।

শ্রী ভাগবতের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অনেক বক্তব্য সামনে এসেছে। এআইএমআইএল-এর সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসির বক্তব্য যে যদি তাঁর গলায় চাকু ধরা হয় তাহলেও তিনি ভারতমাতা কী জয় বলবেন না। 'ভারতমাতা কী জয়' না বলার জন্য মহারাষ্ট্র বিধানসভা এ আই এম আই এস-এর বিধায়ক ওয়ারিস পাঠানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু অসমের ৭৩ বছরের তাজউদ্দিন বরভুঁইয়া বলেছেন যে, 'এই ধ্বনি দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। আমি কি ভারতীয় নই? আমি আসাদুদ্দিনের শ্রেণীভুক্ত নই, আমি ভারতমাতা কী জয় বারবার বলব।' যদিও ১ এপ্রিল ২০১৬-তে জারি করা ফতোয়ায় উত্তরপ্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দের তরফ থেকে বলা হয়েছে 'ভারতমাতা কী জয়ধ্বনি ইসলামের নিয়মবিরুদ্ধ।' কিন্তু মীরাটের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়েছে। এই ব্যাপারে সব থেকে ন্যক্কারজনক মন্তব্য এসেছে নিজেকে ইতিহাসবিদ বলা ইরফান হাবিবের তরফ থেকে। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''ভারতকে মা মনে করার প্রথা প্রাচীন ভারতে ছিল না। এই ধারণা ইউরোপ থেকে এসেছে।''

এখানে আমরা হাবিবের মতো অজ্ঞানীকে প্রখ্যাত ভারতবিদ ও দেশভক্ত আনোয়ার শেখের কিছু কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। তিনি অথর্ববেদের ভূমিসূক্তের উপর টিকা লিখেছেন। নিজের ত্রৈমাসিক পত্রিকা লিবার্টিতে 'ভারতমাতা'র বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'ভূমিসূক্তের ছন্দ ১২-তে দেশবাসীকে ভারতমাতার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে বলা হয়েছে— 'আমি পৃথিবীর পুত্র, পৃথিবী আমার মা।' এই স্তোত্রের মূল কথা হলো যে বৈদিক চিন্তাধারায় সব দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব থাকলেও সবথেকে বেশি গুরুত্ব ভারতভূমিকে দেওয়া হয়েছে। কারণ ভারতে বসবাসকারী সবার মাতা হলো ভারতভূমি। যদিও এই ব্যাপারে দু'রকম বিচারধারার উপর আমাদের নজর দিতে হবে— এক, যে কোনো ব্যক্তি ভারতে থেকে যে কোনো ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে। কেননা ঈশ্বরত্বের ব্যাপারে বৈদিক বিচারধারা এতটাই উদার যে, এর অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ নেই। এইরকম উদারভাব প্রগতিশীল বৈদিক ভাবধারার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। বলা হয়েছে যে কালচক্র নিরন্তর এগিয়ে চলছে। সময়ের পরিবর্তনের ফলে সবকিছুই যুগানুকূল হয়ে পড়ে। সেজন্য সামাজিক সৌহার্দ্যের উপর ধর্মীয় কট্টরতার ছায়া পড়া উচিত নয়।

দুই, এই উদার বৈদিক ভাবনাকে নাকি ভারতমাতার ধারণার দ্বারা সীমিত করা হয়েছে। এই ভূমিতে যারা বাস করে তাদের মানতে হবে যে, তারা ভারতমাতার সন্তান এবং ভারত তাদের মা। 'দেশকে ভালবাসি' এটা বলাই শুধু নিষ্ঠার পরিচায়ক নয়। তা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। এই দেশের সংস্কৃতিকে যারা মানে না তারা এই দেশকে কীভাবে ভালবাসবে?

সংস্কৃত শব্দ 'রাষ্ট্র' একটি রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক ভাবনা, যেটা পশ্চিমের রাষ্ট্র বা রাজ্যের রাজনৈতিক ভাবনা থেকে ভিন্ন। বার্হস্পত্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম্।

তং দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে।।

অর্থাৎ দেবতাদের দ্বারা নির্মিত ও হিমালয় থেকে হিন্দু মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূমি হলো হিন্দুস্থান। একে ভারতবর্ষও বলা হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে,

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রশ্চৈব দক্ষিণম্।

বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

‘মহাসাগরের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে ভূমি অবস্থিত তা হলো ভারত এবং এর অধিবাসীরা হলো ভারতীয়।’ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধীনে প্রভাবশালী মৌর্যবংশের ভিত স্থাপনকারী চাণক্য ঘোষণা করেছিলেন— ‘পৃথ্বয়ঃ সমুদ্র পর্যন্তয়ঃ একঃ রাট’ — সমুদ্র পর্যন্ত যে ভূমির বিস্তার তা এক রাষ্ট্র। ভগবান রামচন্দ্র বলেছেন, ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী’ অর্থাৎ মাতা ও জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও বড়।

অনন্তকাল থেকে আমাদের বৈভবশালী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ অধ্যাত্ম নির্ভর ভাবেই গড়ে উঠেছে। বৈদিক ঋষি অথর্ববেদের এক সূক্তে প্রার্থনা করেছেন, ‘হে মা, যে আমাদের ঘৃণা করে, যে আমাদের উপর শাসন করার জন্য সৈন্য নিয়ে আসে, যে আমাদের অনিষ্ট কল্পনা করে, যে আমাদের মৃত্যু এবং ধ্বংস কামনা করে, আপনি তার সংহার করুন। এই আমার মাতৃভূমি যার কোলে বসে আমার পূর্বপুরুষরা, মহান ঋষিরা যজ্ঞ করেছেন, প্রার্থনা করেছেন এবং ছয় ঋতুর বন্দনা গান করেছেন।

ভারত ভবানী—ভারতমাতা-র মহান পরম্পরার আবাহন করা আমাদের ঐতিহ্য হয়ে আছে। ভারতভূমির ৫১টি শক্তিপীঠের মধ্যে আমরা দেশকে মাতারূপে কল্পনা করে এসেছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের আরাধ্যা দেবী হোন ভারতমাতা। কিছু সময়ের জন্য অন্য দেবতা ভুলে গেলে ক্ষতি নেই’। তাঁর বিদুষী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রার্থনাও রচনা করেছেন।

স্বামী রামতীর্থ দেশভক্তিকে ব্যবহারিক বেদান্তের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ‘ভারতভূমি আমার শরীর। কন্যাকুমারী আমার পদযুগল। হিমালয় আমার মাথা। আমার জটা থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। আমার মাথা থেকে ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু নির্গত হয়েছে। বিন্ধ্যাচল আমার কটিদেশ। করমণ্ডল আমার বাম জঙ্ঘা এবং মালাবার আমার ডান জঙ্ঘা। আমিই সম্পূর্ণ ভারত এবং এর পূর্ব-পশ্চিম হলো আমার দুই হাত।’

তামিলনাড়ুর মহান কবি ও দার্শনিক সি সুব্রহ্মণ্য ভারতী ছোটোদের মাতৃভূমি বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন— ‘এই যে শিশুরা, অখণ্ড ভারতকে দেবীর মতো আরাধনা করে তাঁকে ভালোবাস’।

পাশ্চাত্যের তন্ত্রসাধক স্যার জন বুডরাফ পবিত্র ভারতবর্ষের ছোটোদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘তারা নিজেদের বর্ণকে রক্ষা করার জন্য ও নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করার শক্তি পাবে, যদি তারা নিজের দেশের সেবা এই ভেবে করে যে ভারতমাতার সেবাই মহাশক্তির সেবা। শ্রীশ্রী ভগবতীদেবী তাঁর একরূপ ভারতশক্তিরূপেও প্রকট হন। তিনি কেবল হিন্দুদের দেবীই নন, বরং তিনি বিশ্বমাতাও।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘আধুনিক যুগের একজন ঋষি’ বলে প্রশংসা করতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন— ‘‘যতদিন পর্যন্ত মাতৃভূমিকে শুধুমাত্র ভূমিখণ্ড মনে করা হবে, যতদিন না মহান দিব্যতা ও মাতৃশক্তির সৌন্দর্যরূপে মাথার ওপর ছত্র ধরবে এবং হৃদয় জয় না করবে, আর মায়ের প্রতি স্নেহ ও সেবাভাবে সমস্ত ক্ষুদ্রতা, ভয় ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত না হতে পারছি, ততদিন ডুবতে থাকা এই দেশেকে বাঁচাবার মতো কোনো অলৌকিক রাষ্ট্রপ্রেমের সৃষ্টি হবে না।’’

‘উইশডম অফ ইন্ডিয়া’ পুস্তকে লিন ইউতাং ভারতকে বিশ্বগুরু মেনেছেন। মহান এ এল বেশম্, অর্নাল্ড টয়েনবি এবং চিন্তাবিদ আর. রোনাল্ড, ম্যাক্সমুলার, মোনিয়ার উইলিয়ামস্ এবং আইনস্টাইন জ্ঞান ও বিদ্যার ভূমিরূপে ভারতের প্রশংসা করে গেছেন। ভারতবর্ষের মহান দেশভক্ত-বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাবাদর্শে চালিত মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত সেন্ট ক্যাথরিন অফ সিয়েনা স্কুলের রেভারেন্ড ফাদার ইলান্জিমিট্টম্ তত্ত্বদর্শনে প্রকাশিত বৈদান্তিক ইন্ডিয়া’তে লিখেছেন, ‘‘এই ভারতমাতা প্রকৃতির কোল থেকে জন্ম নিয়েছে এবং আমাদের এই বিশাল ভূখণ্ড নিজেই একটা পৃথিবী।’’

এজন্য এই সত্যকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে নয়, সাধারণভাবেই বোধগম্য হবে যে ‘বন্দেমাতরম্’ ও ‘ভারতমাতা কী জয়’-এর যারা বিরোধিতা করছে তারা দেশভক্ত নয়। এই পবিত্র ভূমিতে তারা আক্রমণকারীর সন্তান। ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশ শাসনকারী নেতৃত্ব এরকম রাষ্ট্র-বিরোধী এবং বিশ্বাসঘাতক শক্তির হাতের পুতুল হয়ে থেকেছে।

১৯৩৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্নর জন ফ্রান্সিস এশলে আর্সকাইন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল তথা ভাইসরয় ভিক্টর হোপকে সংবিধান সভার আয়োজন বৈঠকে বন্দেমাতরম্ গাওয়া বন্ধ করার জন্য লিখেছিলেন। সেই সময় এই ব্যাপারে মুসলমান সদস্যরাও সদন বর্জন করতো। পরে স্বাধীন ভারতেও এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে।

আজ আমাদের ঘুমিয়ে থাকা ধর্মাচার্যদের জাগানোর সময় এসেছে যাতে দেশের প্রত্যেক কোণায় ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি রূপে আরাধনা করাকে উৎসাহ দেওয়া যায়। যে ভারতমাতা সব দেবতা, দেবী, সাধু, ঋষি, সন্ন্যাসী এবং আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের মা, তার প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির নির্মাণ করা উচিত। গর্বিত, দেশভক্ত স্বাভিমানী হিন্দুদের অক্ষয় তৃতীয়া, বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ার মতো উৎসবও পালন করা উচিত। এই দিনগুলি ভারতমাতার আরাধনার জন্য শুভদিন। এইসব পূজার দ্বারা ভারতশক্তির আবাহন করা হয় যাতে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি ও পাপ নাশ হয় এবং দেশের একতা ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

(লেখক ব্যাঙ্গালুরুর সিস্টার নিবেদিতা আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য)

চিঠিপত্র

শাহবানু থেকে সায়রাবানু

স্বস্তিকা পড়ছি অনেকদিন হয়ে গেল। আপনাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তাই গড়ে উঠেছে বলা চলে। সম্প্রতি একটি খবর চোখে পড়ল, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি।

বিখ্যাত শাহবানু মামলার কথা আমরা কেউই ভুলিনি। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্প্রতি সায়রাবানু নাম্নী এক মুসলমান মহিলা মুসলিম পারসোনাল ল'-এর অশিষ্ট বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ দায়ের করেছেন। স্বল্পশিক্ষিতা এই মহিলা উত্তর প্রদেশের কাশীপুরের বাসিন্দা। অভিযোগের বয়ানে তিনি বলেছেন, গত বছরের ১০ অক্টোবর তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দেন। বিয়ের পর থেকেই বাড়তি পণের জন্য স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। এসব কথা যাতে তিনি কাউকে বলতে না পারেন তার জন্য দিনের পর দিন ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করে রাখা হোত। সর্বোচ্চ আদালতের কাছে সায়রাবানুর দাবি, মুসলমানদের তিন-তালাক বা তালাক-ই-বাইয়ত প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। একই সঙ্গে হালাল প্রথাকেও বেআইনি ঘোষণা করুক আদালত। সায়রাবানুর আরও দাবি, ইসলাম পুরুষকে চারটে বিয়ে করার যে মান্যতা দেয় তাও অসাংবিধানিক বলে রায় দিক সর্বোচ্চ আদালত। কারণ ভারতবর্ষে বাস করে চারটে বিয়ে করার অর্থ সংবিধানের নির্দেশ (আর্টিকল ১৪ এবং সেকশন ১৫ থেকে ২৫) অবজ্ঞা করা। অভিযোগ পেয়ে সর্বোচ্চ আদালত তৎক্ষণাৎ মুসলিম পারসোনাল ল'-বোর্ডের মতামত জানতে চেয়েছে। দেখা যাকে এখন তাঁরা কী বলেন। যদিও ল'-বোর্ডের বিবেচনার ওপর ভরসা করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তাও একটা ভেবে দেখার বিষয়। ইসলামের যেসব বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সায়রাবানুর প্রতিবাদ, মুসলিম ল'-বোর্ডের কর্তারা সরকারিভাবেই সেগুলিকে 'ঈশ্বরের নিজের হাতে তৈরি আইন' বলে প্রচার চালিয়ে থাকেন। এই আইনের সামান্যতম পরিবর্তন করাও কোনো রাষ্ট্র বা আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও পৃথিবীর ৬১টি ইসলামিক রাষ্ট্রে এই ধরনের আইন এবং বিধিনিষেধ নিষিদ্ধ। শুধু 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের ক্ষেত্রেই উলটো নিয়ম। সুতরাং সায়রাবানুর লড়াইটা কঠিন। ভরসা একটাই— কেন্দ্রে এখন নরেন্দ্র মোদী সরকার। তাঁর প্রশাসন নিশ্চয়ই সঙ্গী হবে সায়রাবানুর প্রতিবাদের।

—**অচিন্ত্য বেরা,**
তাজপুর, হাওড়া।

শুক্রবার শপথ গ্রহণ

শুক্রবার ২৭ মে দ্বিতীয়বার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। মুসলমান জাহানের (মুসলিম দুনিয়ার) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে শুক্রবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেমন পাকিস্তানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয় শুক্রবার। সেই রকম পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন হলো শুক্রবার। পূর্ববঙ্গ যখন পূর্বপাকিস্তান হলো তখন প্রতি শুক্রবার হিন্দুদের দোকানের ঝাঁপ দুপুরবেলা বন্ধ রাখতে হোত। গুগলে 'Direct Action Day' অনুসন্ধান করে Wikipedia Free Encyclopedia-তে দেখলাম 'The Great Calcutta Killings', ১৯৪৬-এ শুরু হয়েছিল শুক্রবার। পাকিস্তান আদায়ের দাবিতে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয় ১৬ আগস্ট, দিনটি ছিল শুক্রবার। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৪ হাজার হিন্দু কোতল। উদ্দেশ্য প্রাণের ভয়ে হিন্দুরা ও কংগ্রেস যাতে পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়। ঠিক ওই বছর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনটি ছিল শুক্রবার। নোয়াখালিতে ওই শুক্রবার থেকে শুরু হয় একতরফা হিন্দু হত্যা। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কেন যে শুক্রবার শপথ গ্রহণের দিন হিসাবে ধার্য করলেন বুঝলাম না।

—**সুশোভন সরকার,**
দমদম।

আয়ুষ চিকিৎসার জয়গাথা

গত ২৮ মার্চ ২০১৬-এর স্বস্তিকায় ডাঃ অভিষেক ব্যানার্জীর 'সাধারণ রোগবালাইয়েরও সহজলভ্য চিকিৎসা দেওয়া হয়ে উঠছে না।' —শীর্ষক লেখাটি দেখলাম এবং ওই একই সংখ্যায় 'চিকিৎসা পরিষেবা ও গুণমানযুক্ত শিক্ষা সহজলভ্য হোক : আর এস এস'— শীর্ষক অপর তিনটি প্রস্তাবও দৃষ্টিগোচর হলো।

ডাঃ অভিষেক ব্যানার্জী তাঁর লেখায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— 'প্রায়শই ডাক্তারবাবুরা এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে অনিচ্ছা দেখান।' এই প্রসঙ্গে ডাঃ ব্যানার্জী যে কারণগুলি দেখিয়েছেন তার সঙ্গে আরও একটি কারণ যুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা হলো— যাঁরা কাজে যোগ দেন, বাড়ির কাছে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও ওই সকল ডাক্তারবাবুদের অনেক দূরে পাঠানো হয়। কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের কোনো কোনো ভাগ্যবানকে মনোমত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় অজ্ঞাত কারণে, হয়তো বা উৎকোচের বিনিময়ে। এটিও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অবনতির অন্যতম একটি কারণ। উচ্চপদে নীতিহীনতা থাকলে কোনো অবনতিকে উন্নত করা যাবে না।

ডাঃ ব্যানার্জী লিখেছেন— বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে সামান্য অ্যাপেন্ডিসাইটিস, হাইড্রোসিল অপারেশনের জন্যও মানুষকে দৌড়তে হচ্ছে সদর হাসপাতালে বা মেডিক্যাল কলেজগুলোয়। অন্যদিকে আর এস এস-এর তিনটি প্রস্তাবের এক স্থানে বলা হয়েছে— 'আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ও অন্য প্রকারের ঔষধপত্রের গুণমান এবং তার পরীক্ষা ও বিকাশও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' এটি একটি প্রশংসনীয় প্রস্তাব। কারণ প্রস্তাবে ব্যয়বহুল চিকিৎসা পরিষেবার কথা বলা হয়েছে। আসলে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করেই একথা বলা হয়েছে বলেই মনে হয়। ডাঃ ব্যানার্জীও আধুনিক চিকিৎসার দিকে লক্ষ্য করেই অপারেশনের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আয়ুর্বেদ কেবল ওষুধ ভিত্তিক চিকিৎসা নয়, ব্যয়বহুল চিকিৎসাও নয়। আবার দ্রুত আরোগ্যও দিতে পারে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে শল্য চিকিৎসা-সহ অত্যাধুনিক অল্প ব্যয়ে সকল চিকিৎসা পদ্ধতিরই উল্লেখ আছে। আয়ুর্বেদের মর্ম চিকিৎসা (আকুপ্রেসার), অঙ্কুশবেধন (আকুপাংচার) চিকিৎসা, সিরাবেধন চিকিৎসা, অগ্নিকর্ম চিকিৎসা ইত্যাদি শল্যচিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত যার প্রয়োগ অতি অল্প খরচে সহস্র বছর ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে। দীর্ঘ পরাধীনতায় সামাজিক কারণে এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ খুব গোপনে হোত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বিদেশিদের পদলেহী কিছু দেশিসাহেব এই সব চিকিৎসা পদ্ধতির নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলো। চীন কিন্তু এগিয়ে গেল এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে। এটা আমাদের লজ্জা। তবে প্রচার বিমুখ কিছু আয়ুর্বেদাচার্য, যোগাচার্যগণ নীরবে, নিভৃতে ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মহিমান্বিত করে মানবকল্যাণে ভারতমাতার সেবা করে চলেছেন। তাঁদের প্রণাম জানাই।

আয়ুর্বেদের সুশ্রুত সংহিতা মূলত শল্য চিকিৎসা প্রধান গ্রন্থ। মূত্রজবৃদ্ধি (হাইড্রোসিল রোগের সমতুল) রোগে যে শল্যক্রিয়ার উল্লেখ ও বন্ধনের ব্যবস্থা আছে সুশ্রুতে, তাতে ওই রোগ অল্প খরচে আরোগ্য সম্ভব। তবে জ্ঞানতাপস যোগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজজি তাঁর 'যোগবলে রোগারোগ্য' গ্রন্থে সুশ্রুতীয় সূত্র অনুসরণে যে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি দেখিয়েছেন তা প্রয়োগ করে এই পত্রলেখক আশাতীত ফললাভ করেছেন।

সময় থাকতে চিকিৎসা করতে পারলে উণ্ডুক পুচ্ছ প্রদাহ রোগে (অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগের সমতুল্য) কেবল মর্ম চিকিৎসা দ্বারাই রোগ আরোগ্য সম্ভব। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তথা যোগশাস্ত্রে নাভিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নাভিচক্রে বা স্বাধিষ্ঠানচক্রে যন্ত্রদ্বারা যন্ত্রিত করে পরে সুযুম্নাকাণ্ডে অভ্যঙ্গ ও অন্যান্য চিকিৎসা চালিয়ে বিনা ওষুধে কেবল ৫-৭ মিনিটের মধ্যে উণ্ডুক পুচ্ছ প্রদাহর তীব্র যন্ত্রণা আরোগ্য করা সম্ভব। শল্য চিকিৎসার কোনো প্রয়োজনই হয় না। তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে এই প্রক্রিয়া ও পরবর্তী চিকিৎসা অনুসরণ করা ভাল।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত রকমের অপারেশন আছে শতকরা একশোটির মধ্যে ৮০-৮৫টির বিনা অপারেশনে আরোগ্য লাভ সম্ভব। আয়ুষ চিকিৎসায় বড় বড় অপারেশনকে ঠেকিয়ে দেওয়া যায়, অল্প সময়ে অল্প খরচে।

—**কবিরাজ চন্দন পাত্র,**
প্রণবপল্লী, রামপুরহাট, বীরভূম।

বৃদ্ধাশ্রমে কেন?

মা-শব্দটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এবং মায়ের গুরুত্ব আমাদের জীবনে কতটা তা কখনো বলে বা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু এতোটুকু আমরা সবাই জানি যে মা কত কষ্ট করে একটি সন্তানকে জন্ম দেয়, তারপর একটু একটু করে তাকে বড়ো করে তোলে। সমাজে চলার উপযুক্ত করে তৈরি করে। মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য শেষ হবার নয়। মা হলো এমন একজন যার কাছে সন্তান তার স্বর্গ এবং তিনি তার সন্তানের জন্য সবকিছু করতে পারেন। তাহলে কেন আজ বয়স্ক বাবা-মায়েরা বৃদ্ধাশ্রমে? যে সময় তাদের নিজের বাড়িতে সন্তান-নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আনন্দে কাটানোর কথা সে সময়ে কেন তারা বৃদ্ধাশ্রমে চোখের জল ফেলছেন? তবে কি সন্তানেরা বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে?

শুধু বর্তমানকে নিয়ে ভাবলে চলবে না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, বর্তমানের সঙ্গে এবং অতীতের স্মৃতি নিয়ে চলাই তো জীবন। বর্তমান সুখভোগ করতে গিয়ে ভবিষ্যতকে ভুললে চলবে না। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা অতীতের আর অতীতকে সঙ্গে নিয়েই চলে বর্তমান। তাই ভুললে চলবে না যারা আমাদের জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন তাদের গুরুত্ব কতটা আমাদের জীবনে। আমাদের জীবনে তাদের অবদান কতটা। আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করেছি যে মায়ের কাছে কতটা সুখ পাওয়া যায়।

একটি সন্তানের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ ও সুখের আশ্রয় হলো মায়ের কোল। মায়ের কোলে অফুরন্ত শান্তি, অফুরন্ত সুখ, অফুরন্ত স্নেহ থাকে তা আমাদের অজানা নয়। মা নিজের সর্বস্ব দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখেন। সন্তানকে সমাজের যোগ্য উপযুক্ত করে তোলেন বাবা-মা। কিন্তু বড়ো হয়ে সন্তান বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য ভুলে গিয়ে এমন ব্যবহার দেখায় যাতে তাদের সেই পরিবেশে থাকা দুষ্কর হয়ে ওঠে। কোনো সন্তানরা আবার বাবা-মার হাত থেকে মুক্তি পেতে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। এভাবে প্রত্যেকটি সন্তান যদি নিজের বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে তাহলে সমাজের অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হবে। বাবা-মার প্রতি অবহেলার অর্থ হলো দায়িত্ব এড়িয়ে চলা, তাদের কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়া— এটা সুস্থ সমাজের চিত্র হতে পারে না। নীতিবোধ, সৌজন্যবোধ, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ এবং শালীনতাবোধ এসব আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এসব বোধ হারিয়ে আমরা আপনজনকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না। এসব যদি হারিয়ে যায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগোবে কীভাবে? আমাদের প্রত্যেকের উচিত আগামীদিনের কথা ভাবা। আমরা নিজেরা যদি দায়িত্ব- কর্তব্যবোধের দ্বারা নিজের পিতৃ-মাতৃ সম্পদকে সঠিকভাবে রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমাদের পরের প্রজন্ম সঠিক শিক্ষা পাবে কী করে। আমরা যদি বাবা-মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার আগে একবার ভেবে দেখি যে তারা আমাদের জন্য কী কী করেছেন তাহলে কিন্তু এই বাবা-মা নামক ভগবানের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। আমরা প্রত্যেকেই বাবার ছায়া ও মায়ের স্নেহ-মমতায় বড় হয়েছি। প্রত্যেকেরই সবচেয়ে বড় আশ্রয় বাবার ছায়া ও মায়ের আঁচল— এটা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না।

আমাদের সবচেয়ে বড় ভগবান বাবা-মা। আমরা যদি সেই ভগবানের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করি তাহলে শুভ কামনার জন্য অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন হবে না।

—**চম্পা মণ্ডল,**
মুরারীপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাজা
ছত্রপতি শিবাজী

কালিদাস বসু

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। বলা হয়েছে ভারতকে সার্বভৌম, সমাজবাদী, সেকুলার, গণতান্ত্রিক, সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এবং ন্যায় বিচার, স্বতন্ত্রতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মানসে আমরা ভারতবাসী সংবিধানকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু সেকুলার শব্দটি নিয়ে আমাদের দেশে চিন্তাজগতে জটিলতার একটি আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

'সেকুলার' শব্দটির সংজ্ঞা বা সাংবিধানিক কোনো ব্যাখ্যা সংবিধানে নেই। অভিধানে ইংরাজি 'সেকুলার' শব্দটির কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা এই অর্থ দেখা যায় না। ভারতবর্ষে 'সেকুলার' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রায় সমার্থবোধক শব্দরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ইতিহাস বলে ভারতে বৌদ্ধ শাসনের কিছুকাল ব্যতিরেকে ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালনায় কোনো বিশেষ ধর্মমত বা ধর্মাচরণকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। প্রত্যেকটি পূজাপদ্ধতি প্রতিটি ধর্মাচরণ সম্পর্কে রাষ্ট্র ছিল সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। ভারতীয় রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি ও ধর্মাচরণ বিষয়ে রাষ্ট্রের অনুপম সমদর্শিতা ধর্মনিরপেক্ষতা নামে অভিহিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই শাশ্বত সনাতন সমাজ চিরকালই ধর্মনিরপেক্ষ।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, এই প্রাচীন দেশের সনাতন বা হিন্দু সমাজের মূল জীবনস্পন্দন ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য জগৎসভায় প্রমাণিত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু আমাদের এই সমাজের ধর্মচেতনা ধর্মের উন্মাদনায় পরিণত হয়নি। ভারতের ধর্মবোধ উদারতায় প্রসন্ন হয়েছে, সঙ্কীর্ণতায় ক্লিষ্ট হয়নি।

ভারতের ইতিহাসে ছত্রপতি শিবাজীর ধর্মচেতনা ও ধর্মাচরণ এক অতুলনীয় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ১৬৫৫ সালে শিবাজী তাঁর সমস্ত রাজ্য তাঁর দীক্ষাগুরু সমর্থ রামদাস স্বামীকে নিবেদন করেছিলেন। এক পত্রে ছত্রপতি তাঁর গুরুদেবকে বলেছেন যে যখন তিনি তাঁর সমস্ত রাজ্য তাঁকে সমর্পণ করে তাঁর কাছে থেকে তাঁর চরণসেবা করতে চেয়েছিলেন তখন সমর্থ রামদাস স্বামী শিবাজীকে আদেশ করেন যে রাজধর্ম পালন করাই শিবাজীর যথার্থ কর্তব্য। তাঁর কথায়, 'রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন'— ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সাধনায় ব্রতী হবার নির্দেশ শিবাজী তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে লাভ করেন।

শিবাজীর ধর্মরাজ্য পরিচালনার মর্মবাণীটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিধৃত হয়েছে— ''শিবাজী যখন ঔরঙ্গজেবের জালে জড়িত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরে যাপন করিতে হইয়াছিল, তখন যে তাঁহার কীর্তি ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ সেই সময় ধর্মবুদ্ধির সহিত তাহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুত তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্মসাধনার একটি প্রকাশ... ব্যক্তিগত মহাশক্তির সঙ্গে দেশের শক্তিকে মিলাইতে পারে... ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে।'' শিবাজী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বর্তমান সময়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। আমাদের দেশের ধর্মবোধের সঙ্গে শিবাজী নিজেকে যুক্ত রেখে সমগ্র সমাজের সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্থাপন করেছেন। বাংলার তথা ভারতের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ শিবাজী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল সূত্রটি উপলব্ধি করলে প্রকৃত ধর্মবোধ বা ধর্মাচরণ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ করতে পারবেন।

গুরু রামদাসের উদ্বোধনী মন্ত্রে—''বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো''— উজ্জীবিত শিবাজী ধর্মের সঙ্গে কর্মের মণিকাঞ্চন যোগে জাতির মধ্যে অনেক আকাঙ্ক্ষার প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার করেছিলেন। গুরু রামদাসের বসন গৈরিক। ছত্রপতি শিবাজীর পতাকা গৈরিক। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন যে, ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করে, পাছে তার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুকিয়ে থাকে।

হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর আস্থা, হিন্দুদেবীর নিকট প্রাণোৎসর্গের সঙ্কল্প, হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা শিবাজীর দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছে, সঙ্কুচিত করেনি। এটি সর্বজনবিদিত যে শিবাজী মহারাজ তুকারামের ভক্ত ছিলেন ও সমর্থ রামদাস যথার্থই শিবাজীকে 'শ্রীমন্ত যোগী' বা 'রাজর্ষি' আখ্যা দিয়েছিলেন। অনেক সাধুসন্তের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান ফকির— বাবা ইয়াকুব।

হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সর্বজনীন ও উদার। এর প্রভাবে শিবাজী কখনোও কোরান শরিফ, মসজিদ বা স্ত্রী জাতির অবমাননা হতে দিতেন না। যুদ্ধের সময় কোরান হাতে এলে তা সসম্মানে কোনো মুসলমানের হাতে পৌঁছে দিতেন। বন্দি মুসলমান স্ত্রীলোককে কোনো সম্পন্ন মুসলমানের বাড়িতে রাখা হোত। মৌলবি বসিরউদ্দিন আহমদ তাঁর রচিত বিজাপুরের ইতিহাস 'বাকিরত্-ই- সামলিয়ত্-ই- বিজাপুর' গ্রন্থে শিবাজীর কোরান ও মসজিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা লিপিবদ্ধ করেছেন। বস্তুত শিবাজী মুসলমান আধিপত্য উৎখাত করার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো বৈরীভাব ছিল না।

বিজাপুরের বাদশাহ শিবাজীকে দমন করার জন্য আফজল খাঁকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আফজল খাঁ-র হত্যার জন্য সমসাময়িকগণের কেউই শিবাজীকে দোষী করেননি। আফজল খাঁর হত্যার কিছুকাল পরে বিজাপুরের সুলতান ও শিবাজীর মধ্যে কিছু পত্রের আদান প্রদান হয়। সুলতানের লেখা দুটি পত্র আজও সাতারার সংগ্রহশালায় আছে। এই পত্রগুলোতে শিবাজীকে 'মূর্তি-উল-ইসলাম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মূর্তি-উল- ইসলামের অর্থ হলো— ইসলামের বন্ধু।

পরবর্তী সময়ে মোগল আক্রমণে নিতান্ত বিপন্ন হয়ে বিজাপুরের রাজমাতা শিবাজীর কাছে সাহায্য চেয়ে এক পত্রে জানালেন— 'আপনি এ রাজ্যের অবস্থা জানেন, আমাদের সৈন্য নেই, অস্ত্র নেই, বন্ধু নেই। শুধু সেনা চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, আপনার সাহায্য না পেলে আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ। দয়া করে আমাদের দিকে চেয়ে দেখুন। পত্রপ্রাপ্তিমাত্র মহানুভব শিবাজী সৈন্য পাঠিয়ে মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁকে বিজাপুরের উপকণ্ঠ হতে বিতাড়িত করেন। শিবাজী চিরদিনের বন্ধুর মতো মহাসমারোহে বিজাপুরের পথে অগ্রসর হলেন। আকাশ বাতাস তাঁর জয়ধ্বনিতে মুখরিত। জানি না তখন কারুর মনে হয়েছিল কিনা যে ইনিই সেই শিবাজী যাঁর পিতাকে বিজাপুরের সুলতান একদিন বন্দি করেছিলেন, যাঁর হাতে বিজাপুরের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি আফজল খাঁ নিহত হয়, যিনি বারবার বিজাপুরকে আক্রমণ করে রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করেছিলেন। বিজাপুরের রাজমাতা আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাজা হিসাবে বিপদের সময়ে শিবাজীর কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন।

অথচ বর্তমানে আমাদের দেশে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব অনুভূত হয়। এর কারণ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্রয় না করে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার ও প্রসার। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাজা ছত্রপতি শিবাজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারা আমাদের জাতির আলোকবর্তিকা হোক।

সাহায্য সূত্র : (১) রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮।

(২) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন, ১৩৬৯।

(৩) রামদাস ও শিবাজী— চারুচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

(হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব উপলক্ষে পুনর্মুদ্রিত)

শক্তিক্ষেত্র শ্রীলঙ্কা

নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বের কোণে কোণে। তার প্রমাণ আমরা যেমন মরিশাস মায়নমার ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ায় পাই, আবার সুদূর লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশেও পাই। সেই অর্থে শ্রীলঙ্কা আমাদের খুবই কাছের দেশ। ভারতবর্ষ থেকেই বৌদ্ধধর্ম সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু একটা কথা আমরা অনেকেই জানি ভগবান বুদ্ধের পাশাপাশি হিন্দুধর্মের শক্তিতত্ত্বও ছড়িয়ে পড়েছিল সে দেশে।

হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগেকার কথা। বৌদ্ধধর্ম তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত। সম্ভবত তন্ত্রের হাত ধরেই শক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে শ্রীলঙ্কায়। গড়ে ওঠে কালীমন্দির। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষ পাদে প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এইচ সি পি বেল অনুরাধাপুরমের উত্তর শহরতলিতে খননকার্য চালিয়ে ১৬টি এরকম মন্দিরের সন্ধান পান। জায়গাটা জেতোবনরামায়া ও

বিজয়ারামায়া বৌদ্ধমঠের কাছাকাছি। বেলসাহেব মনে করলেন মন্দিরগুলো তামিল সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। তামিলদের মধ্যে কালীপুজোর চল আছে। তাছাড়া মন্দিরগুলির গঠনে পল্লব স্থাপত্যরীতির প্রভাব এবং তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ দুটি প্রস্তরলিপিও বেলসাহেবকে এরকম ভাবতে বাধ্য করেছিল। নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর পুরাতত্ত্ববিদরা একমত হলেন, মন্দিরগুলি নবম শতকে তৈরি হয়েছিল। যে মূর্তিকে ঘিরে এতগুলি মন্দির, হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব অনুযায়ী তাঁকে আমরা ভদ্রকালী রূপে চিনি। আজও তিনি ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরে এই নামেই পূজিত হন।

পোলোন্নারুয়া শহরের খুব কাছেই, থুরুপারামা ও রঙ্কোট বিহারের মাঝামাঝি অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে চার-চারটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্যে একটি কালীমন্দির। দ্বীপরাষ্ট্রের একেবারে দক্ষিণে— কাটারাগামা এবং কাথিরকামাম শহর, সেখানেও হিন্দু দেবদেবীদের গর্বিত পদচিহ্ন। একটি কালীমন্দির। অন্যটির অধীশ্বর স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিকেয়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, যে সময়ে এইসব মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং পরম্পরাগত ভাবে হিন্দু সংস্কৃতি জনমানসে জায়গা করে নিয়েছিল, তখন শ্রীলঙ্কায় (তৎকালীন সিংহল) চলছে রাজতন্ত্র। সুতরাং রাজার আনুকূল্য না পেলে হিন্দুত্বের এই প্রসার সম্ভব নয়। কাথিরকামামের কালীমন্দিরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর রাজা প্রথম রাজসিংহে। যদি দ্বীপরাষ্ট্রের দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে সর্বত্র দেখা যাবে দেখব একই ছবি। পশ্চিম উপকূলের প্রধান দেবতা মুন্নেশ্বরম শিব। বিশাল মন্দির। পাশেই একটি কালীমন্দির। প্রকৃতি ও পুরুষের সহাবস্থান। মুন্নেশ্বরমের বর্তমান মন্দিরটি যদিও অপেক্ষাকৃত নবীন। প্রাচীন মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৪শ শতকে। ১৬শ শতকে পর্তুগিজরা সে মন্দির ধ্বংস করে মন্দিরের জমি জেসুইটদের হাতে তুলে দেয়। ১৭৫৩ সালে রাজা কীর্তি শ্রীরাজ সিংহে নতুন করে মন্দিরটি তৈরি করিয়ে দেন। মুন্নেশ্বরমের শিবমন্দির এক সময়ে সমগ্র দ্বীপে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। শ্রীলঙ্কার প্রাচীন তামিল জনগোষ্ঠী এই মন্দিরের দেখাশোনা করে থাকেন।

দ্বীপরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেনটোটা শহর। সেখানে ১২শ শতকের এক কালীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরটি রাজা দ্বিতীয় পরাক্রম বাহুর আমলে তৈরি। এই মন্দিরও পর্তুগিজরা ধ্বংস করেছিল।

এবার যাওয়া যাক শ্রীলঙ্কার সব থেকে প্রাচীন হিন্দু তীর্থের দিকে। দ্বীপের পূর্ব উপকূলে ত্রিঙ্কোমালি শহর। অনেকে তিরুকোণেশ্বরমও বলে থাকেন। এখানকার সব থেকে বিখ্যাত মন্দিরের অধীশ্বর শিব। সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ অনুযায়ী এই মন্দির তৈরি হয়েছিল চতুর্থ শতকে। শিবমন্দির থেকে আন্দাজ ১ কিলোমিটার দূরে কালীমন্দির। অদূরে হিন্দু কলেজ। ত্রিঙ্কোমালি কালী 'নগরকালী' রূপে পরিচিত। দেবীকে সবাই অভিভাবক মানেন। আশীর্বাদ না নিয়ে কোনো কাজ শুরু করেন না।

একেবারে উত্তরে বীর মা-কালী আম্মান মন্দির। এই মন্দির বহু ঘটনার সাক্ষী। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাজা সাংগিলি এবং পর্তুগিজদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। প্রথমবার পর্তুগিজরা হেরে গেলেও পরে তারা জাফনা শহরের দখল নেয় এবং এই মন্দির ধ্বংস করে। ১৮০০ সালে মন্দির আবার নতুন করে তৈরি করা হয়।

মধ্যযুগে হিন্দুমন্দির ধ্বংস নতুন কোনো ঘটনা নয়। শাসক মুসলমান নবাব-বাদশাহ্‌রা তো বটেই, পর্তুগিজ মগ আরাকান জলদস্যুরা পর্যন্ত বহু মন্দির ধ্বংস করেছে। অথচ শ্রীলঙ্কায় অন্য ছবি পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যযুগেই হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শাক্ত ও শৈব পরম্পরার প্রসার ঘটেছে সে দেশে। অনেক সময়ে দেশের রাজাই নিয়েছেন প্রসারের ভার। এর কারণ কী? একটা কারণ অবশ্যই সে সময় শ্রীলঙ্কায় তামিলদের প্রাধান্য। মূলত তাদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। কতটা গভীর শ্রীলঙ্কায় হিন্দুত্বের শিকড়? এই প্রশ্নের জবাব আমরা পাব সে দেশের সাহিত্যে। শ্রীললিতা সহস্রনামায় প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাকালীর। সেখানে দেবীকে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রীমহারাজ্ঞী (সম্রাজ্ঞী), কামদায়িনী (যিনি সকল কামনা পূরণ করেন), ভয়-পাহ (যিনি সকল ভয় দূর করেন), দুঃখহন্ত্রী (যিনি সকল দুঃখ হরণ করেন), ধর্ম-অধর্ম বিবর্জিতা (যিনি পাপপুণ্যরহিত), অনাদি-নিধন (যার শুরু বা শেষ নেই), বিজয়া (যিনি চিরজয়ী) ইত্যাদি বিবিধ রূপে।

১৩শ শতকে পালি সাহিত্য ধম্মপদ আট্টাকথা সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। নাম স্বধর্ম রত্নবলয়। বুদ্ধদেবের উপদেশগুলিকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করাই প্রধান উদ্দেশ্য। একটি কাহিনির সূত্রে, তথাগতের নির্বাণতত্ত্ব বোঝাবার জন্য মহাকালের রূপক হিসেবে লেখক নিয়ে এলেন মহাকালীকে। হিন্দু পরম্পরা এবং বৌদ্ধধর্মের মিশেল ঘটল! এই সমন্বয়ের প্রধান রূপকার শ্রীলঙ্কার সাধককবি ধর্মসেনা থেরা।

একথা অনস্বীকার্য শ্রীলঙ্কায় মহাকালী শুধু জনপ্রিয় নন, সাধারণ মানুষের গভীরে তাঁর চিরকালীন স্থান। আবালবৃদ্ধবনিতা বিশ্বাস করেন যে-কোনো বিপদআপদে মা তাদের রক্ষা করবেন। পথ দেখাবেন। ■

বিট্টুর ভয়

সারাদিন টিপ টিপ করে পড়ার পর বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা একটু বিরাম দিয়েছে। খনাখন্দ সব জলে ভর্তি। এদিক ওদিক থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। গ্রামে এখনো বিদ্যুৎ আসেনি। রাতে কেরোসিনের আলোই একমাত্র ভরসা। বৃষ্টির মধ্যেই বিট্টুর বাবা হাটে গেছে। কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। এদিকে ঘরে কেরোসিন নেই। বিট্টুর মা মহাচিন্তায় পড়ে গেল। রাতে আলো জ্বলবে কীভাবে? বিট্টুর পড়াশুনা আছে।

ক্লাস সিক্সে পড়ে বিট্টু। মায়ের চিন্তা দেখে সে বলল— তুমি আমাকে পয়সা দাও আমি হরিকাকার দোকান থেকে কেরোসিন এনে দিচ্ছি। বিট্টুদের বাড়ি থেকে হরিকাকার দোকান আধমাইল দূরে। মা বলল— ভয় করবে না তো? বিট্টু মাথা নাড়লো। মা তখন টাকা আর একটা লম্বা মুখওয়ালা কাচের বোতল ওর হাতে ধরিয়ে দিল। বলল— তাড়াতাড়ি যা। অন্ধকার হওয়ার আগেই ফিরবি। পয়সা আর বোতল নিয়ে বিট্টু হাঁটা লাগালো। রাস্তা নেহাত কম নয়। তার উপর কাদাজলে রাস্তা পিছল। কোথাও কোথাও জল জমে আছে। একবার পা পিছলে গেলে আর রক্ষে নেই, কাদাজলে সব একাকার হয়ে যাবে। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। আধ মাইল হেঁটে বিট্টু যখন হরিকাকার দোকানের কাছাকাছি পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দোকানে গিয়ে দেখে— হায় কপাল, দোকান তো বন্ধ! জিজ্ঞেস করবে এমন কেউ আশেপাশে নেই। তখন অগত্যা আবার বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

রাস্তার চারিদিকটা একেবারে শুনশান। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। অন্ধকার তেমন গাঢ় হয়নি। কোনো রকমে রাস্তা দেখে সাবধানে হাঁটতে লাগল বিট্টু। দূরের বাঁশবন দেখা যাচ্ছে। বাতাসে বাঁশের মাথাগুলো নড়ছে। ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিট্টুর গা যেন কেমন ছম্ ছম্ করে উঠলো। একজন সঙ্গী থাকলে খুব ভালো হোত। যাক এখন সে সব ভেবে আর কাজ নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে বিট্টুর এক সময় মনে হলো শন শন করে কী যেন একটা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা এক নাগাড়ে নয়, থেমে থেমে হচ্ছে। প্রথমে ভাবলো মনের ভুল। পরে মন দিয়ে শুনলো না সত্যি একটা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। বিট্টু রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটাও যেন থেমে গেল। যেই হাঁটতে শুরু করলো আবার সেই শন্ শন্ শব্দ। বিট্টুর গা শিউরে উঠলো। একবার পিছন ফিরে দেখতে চাইলো কিন্তু সাহস হলো না। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বিট্টুর। রাস্তা দিয়ে কোনো লোকও যাচ্ছে না।

সামনেই একটা বাঁশবাগান সেটা পেরোলেই বাড়ি। সে শুনেছে এই বাঁশবাগানে নাকি ভূত থাকে। ওরা রাস্তায় বাঁশ ফেলে রাখে। বাঁশবাগানের কাছে পৌঁছতেই বিট্টুর ভয় যেন আরো বেড়ে গেল। এদিকে শন্ শন্ শব্দটা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিড় বিড় করে রাম রাম বলতে লাগলো বিট্টু। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। খুব ভয়ে ভয়ে বিট্টু বাঁশবনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলো। এই বুঝি পেছন থেকে তার ঘাড়ে ভূত লাফিয়ে পড়ে কিংবা সামনে একটা বাঁশ ফেলে দেয়। এমন সময় পেছন থেকে কেউ সাইকেলের বেল বাজালো। কেউ একজন সাইকেল নিয়ে আসছে। সাইকেলটা একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বিট্টু শুনতে পেল— 'সন্ধ্যেবেলা কোথায় গেছিস বিট্টু'। এতো বাবার গলা! বিট্টু যেন প্রাণ ফিরে পেল। বাড়ি ফিরে সব সে খুলে বলল। শুনে বাবার তো হাসি থামে না। তারপর হাসি থামিয়ে বাবা বলল— তোর হাতে কী ছিল? বিট্টু বলল— ওই লম্বা মুখওয়ালা কাচের বোতল।

—আরে বোকা! ওই বোতলের ভিতর বাতাস ঢুকছিল। তাতেই শন্ শন্ করে আওয়াজ হচ্ছিল। আর তাই শুনে তুই এতো ভয় পেলি!

শব্দের রহস্যটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। বিট্টু নিজের বোকামোটা বুঝতে পেরে খুব লজ্জা পেল।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

ছত্তিশগড়

আগের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ১৬টি জেলা নিয়ে ছত্তিশগড় রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ২০০০ সালের ১ নভেম্বর। এই রাজ্য জনজাতি বহুল। পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র, পূর্বে ঝাড়খণ্ড ও অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণে তামিলনাড়ু এবং উত্তরে উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ। আয়তন ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৯১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪০ হাজার ১৯৬ জন। ভাষা হিন্দী। রাজধানী রায়পুর। এই রাজ্যের ৪৬ ভাগ বনাঞ্চল। তেন্দুপাতা, চিরোঞ্জী, হরিতকি, বহেড়া, শাল, মহুয়া ইত্যাদি বনজ সম্পদ। পাহাড়ি এলাকা হওয়ার জন্য কৃষিভূমি খুবই কম। কয়লা, তামা, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই রাজ্য। বিশ্ববিখ্যাত হিরের খনি রায়পুর জেলার দেওভোগে অবস্থিত। ভিলাইয়ে ইস্পাত কারখানা ও কোরবায় অ্যালুমিনিয়াম কারখানা রয়েছে। অম্বিকাপুরে প্রাচীন গুহা, জগদলপুরে অভয়ারণ্য, রাজনন্দগাঁওয়ে বৌদ্ধমঠ, দান্তওয়াড়ায় দন্তেশ্বরী মন্দির ও মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের জন্মস্থান চম্পারণ্য দর্শনীয় স্থান।

প্রশ্নবাণ

১. অসমের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী?

২. ত্রিপুরার রাজ্যপাল কে?

৩. সুন্দরবন কোন্ জাতীয় অরণ্য?

৪. 'জনগণমন' কত সালে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়?

৫. ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম কোথায়?

উত্তর : ১. সর্বানন্দ সোনোয়াল। ২. তথাগত রায়। ৩. ম্যানগ্রোভ। ৪. ১৯৫০। ৫. অযোধ্যা।

ছবিতে অমিল খোঁজ

ছোটদের কলমে

গরমকাল

ঋকদীপ কর্মকার, ষষ্ঠ শ্রেণী

গরম গরম ভীষণ গরম
আম পেকে সব হচ্ছে নরম,
চারিদিকে বইছে লু
ঝলসে গেছে গাছ,
পুকুরগুলোয় শুধুই কাদা
উধাও সকল মাছ।

ভোটের জন্য বন্ধ স্কুল
পড়া উঠল লাটে,
সারাদিন শুধু তাইরে নাইরে
দিন কাটে মাঠে ঘাটে,
মায়ের ভয়ে সন্ধেবেলা
কেবলমাত্র একটু পড়া।।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

গোয়েন্দা পেশায় রজনী পণ্ডিত

রিনি রায়

'গোয়েন্দা' মাত্রেই আমাদের মনে ভিড় করে আসে গোটাকতক নাম— শার্লক হোমস্, ফেলুদা, ব্যোমকেশ বক্সী, কিরীটি, অর্জুন, কাকাবাবু, মিস মার্পল আর বাঙালির একান্ত আপন মিতিন মাসি। কৈশোর থেকে শুরু করে সমস্ত বয়সের, সমস্ত রকম মানুষের পছন্দ গোয়েন্দা গল্প। তবে লক্ষণীয় বিষয় যে এই গোয়েন্দাদের সারিতে মহিলা গোয়েন্দা কিন্তু হাতে গোনা। এই অবস্থা যেমন সাহিত্যে, তেমন বাস্তবেও। এই পেশায় মেয়েদের খুব একটা বেশি সক্রিয় হতে দেখা যায় না। এর কারণ যদি জানতে চাওয়া হয়, তবে তা এককথায় বলা যেতে পারে সামাজিক; এছাড়া অনুপ্রেরণা বা রোল মডেলের অভাব। তবে 'অনুরাগ' বলে একটা মানসিক স্থিতি সবার মধ্যে থাকে যা তাকে তার জীবনের পছন্দমতো পথ বেছে নিতে সাহায্য করে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল ভারতের প্রথম প্রাইভেট গোয়েন্দা রজনী পণ্ডিতের ক্ষেত্রে।

মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় পালগড়ের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। মারাঠি সাহিত্য নিয়ে মুম্বইয়ের রূপারেল কলেজ থেকে স্নাতক। ইচ্ছা ছিল শিক্ষক অথবা উকিল হওয়ার। কিন্তু বিধাতা রজনীর জন্য অন্য কিছু ভেবে রেখেছিলেন।

কলেজে পড়াকালীন তাঁরই এক সহপাঠী বিপথে যাচ্ছে দেখে সমস্ত বিষয়ে আটঘাট বেঁধে খোঁজখবর নিয়ে তার অভিভাবককে যখন রজনী খবর দেয়, তখন কৃতজ্ঞচিত্ত পিতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে 'তুমি কি গোয়েন্দা?' এই জিজ্ঞাসাই তাঁর মনে গোয়েন্দাগিরির ইচ্ছার বীজ বপন করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল বিভিন্ন পরিবারের মানুষগুলো যখন কোনো কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাদের মনে সাহস জুগিয়ে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়ে সে আদতে সমাজেরই সেবা করছে। কলেজ শেষে তিনমাস একটি অফিসে সাময়িক কাজ করার পর ১৯৯১ সালে মুম্বইয়ের মহিমে আত্মপ্রকাশ করে ভারতের প্রথম মহিলা গোয়েন্দা রজনী পণ্ডিতের অফিস 'রজনী পণ্ডিত ডিটেকটিভ সার্ভিসে'স যা 'রজনী ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো' নামেও পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অফবিট পেশায় যখন তিনি প্রবেশ করেন তখন তার বয়স মাত্র ২৫ বছর।

গল্পের বইয়ের পাতায় পড়তে যত রোমাঞ্চ লাগে, বাস্তবে গোয়েন্দা জীবন বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ। যে-কোনো সময় যে-কোনো অজানা অচেনা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আর সেক্ষেত্রে মেয়ে হিসাবে একটা ঝুঁকি তো থেকেই যায়। তবে রজনী কোনো কিছুকেই ভয় পান না। তিনি বলেন, 'শুরু থেকে আমি এটাই জানি যে আমরা একমাত্র যে জিনিসকে ভয় পাই, তা হলো মৃত্যু এবং এটা যে-কোনো ভাবেই আসতে পারে। ধরুন আপনি যখন বসার ঘরে বসে আছেন, তখন ছাদ ভেঙে পড়েও আপনার মৃত্যু হতে পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে এমনকিছু নেই যাকে ভয় পাওয়া যায়।' এমন মৃত্যুভয়হীনা নারী যে এই পেশার উপযুক্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তিনি যখন বাড়িতে এই পেশায় আসার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন, তখন তাঁর বাবা যিনি কিনা পেশাগত জীবনে সি আই ডি-তে কাজ করেছেন তিনি কিন্তু মেয়ের এই ইচ্ছাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে এ কাজ মেয়েদের উপযোগী নয়। কিন্তু তাঁর মা সদাসর্বদা তাঁর পাশে থেকেছেন।

১৯৯১-এ যাত্রা শুরু করে এতগুলো পথ পেরিয়ে এই ২৫ বছরে রহস্যের জট খোলার সংখ্যাটা মোটেই হেলাফেলার নয়— ৭৫ হাজার! এখন তাঁর নেতৃত্বে কাজ করছে ২০ জনের একটি টিম। যে-কোনো গার্হস্থ্য সমস্যা, কোনো কোম্পানির হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বার করা এবং খুন-খারাপির ক্ষেত্রেও তদন্ত অভিযান চালিয়েছেন তিনি। কখনও অন্ধমহিলা সেজে, কখনও বা গর্ভবতী, কাজের বৌ, বোবাকালা সেজেও অনেক রহস্যের কিনারা করেছেন। মুম্বইয়ের সিনেমা জগতের বহু স্টারও বিপদে আপদে তার শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন এসেছিলেন তখন এই পেশায় সুষ্ঠ ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতি পদে অনেক বাধা ছিল। তখন না ছিল গোপন ক্যামেরা, বাগস (গোপন মাইক্রোফোন), ডিজিটাল রেকর্ডার, মোবাইল ফোন। তাছাড়া সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তো ছিলই। একবার তিনি এক খুনিকে ধরার জন্য একজনের বাড়িতে ছ'মাস ঝি-য়ের কাজ করেছেন। দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে রজনীর গোয়েন্দাগিরির খ্যাতি। তাকে নিয়ে দিনকর রাও একটি ডক্যুমেন্টারিও করেছেন— শীর্ষনাম 'Lady James Bond'। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি সকলের সাথে ভাগ করে নিতে লিখেছেন, 'Faces Behind Faces' এবং 'Mayajal'। পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। প্রথম বইটির জন্য দু'টি এবং পরেরটির জন্য ছ'টি। এছাড়া পেয়েছেন দূরদর্শনের 'হিরকানি' পুরস্কার।

এই পেশায় রজনীর কৃতিত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে রজনী প্রমাণ করেছেন মেয়েরা শত প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা জয় করে যে-কোনো পেশাতেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। ■

অতিথি কলম

এম জে আকবর

কংগ্রেস আজ হারানো দিনের গল্প

রাহুল গান্ধীর আঞ্চলিক দলগুলির লেজুড়বৃত্তি করার রাজনীতি লাট খেয়ে পড়েছে

জন্মদিনের উপহার হিসেবে তাঁর সরকারের দু’ বছর পূর্তিতে কেরল নির্বাচনে ১টি আসন ও ভোট বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে অসমে জোটসঙ্গীদের নিয়ে এই প্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের থেকে আর আনন্দের কীই বা হতে পারে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। দু’টি ঘটনাই অভূতপূর্ব। অসমের জয়কে যদি একটি বাগানের ফুলগুলির ক্রমশ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে কেরলে রোপিত বীজ অচিরে মহীরুহের আকার নেওয়ার সম্ভাবনাময়।

অন্যদিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে রাহুল গান্ধীর ল্যাজ ধরে চলার নীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে এর মধ্যেও কিন্তু সারবত্তা খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। একটি সবিশেষ হতাশাগ্রস্ত দলের পক্ষে মরিয়া হয়ে যদি কিছু রাজনৈতিক জমি ধরা যায় এটি তারই প্রয়াস হতে পারে। রাহুল গান্ধী একটা বিষয় নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন যে কংগ্রেস আজ এক নিঃশেষিত শক্তির দল। তাই এদিক থেকে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে গেলে যে কোনো দলের সঙ্গে গাদাবোট হয়ে থাকার কৌশল দরকার। অবশ্যই যদি সেই দল সেই বোঝা টানতে রাজি থাকে। এই থিয়োরির প্রবক্তারা আবার ভেবেচিন্তে দেখেছেন এই কংগ্রেস যদি এই ভাবে লেজুড় হয়ে থাকার অভ্যাসটাকে অধিকাংশ রাজ্যে চারিয়ে দিতে পারে সেক্ষেত্রে একদিন অতবড় লম্বা ল্যাজ নিশ্চয় মাথাটাকে নাড়িয়ে দিতে পারবে আর অমনি দল সামনে চলে আসবে। এই পদ্ধতিতে বিচিত্র ধরনের দলের সঙ্গে কংগ্রেস মিলে-জুলে চলবে আর এই চরিত্র হারানোর ব্যাপারে কংগ্রেসী মাতব্বররা আদৌ চিন্তিত নন। আঞ্চলিক দলগুলি কৌশলটা যে বোঝেনি তা নয়, তবুও তারা চালিয়ে যাচ্ছে কেননা তারা খুব ভালই জানে যে কংগ্রেস তাদের ব্যবহার করে যতটা লাভ পাবে তার থেকে ঢের বেশি লাভ কংগ্রেসকে ব্যবহার করে তারা উশুল করবে।

জেনে রাখা দরকার, যেদিন বিহার বিধানসভায় জনতা দলের জোট বড় জয় পেল যার সঙ্গে লেজুড় হিসেবে কংগ্রেসও ছিল সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার বিহারের ওপর তাঁর সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাঁর নজর চলে যায় দিল্লীর দিকে। আর বলে দিতে হয় না যে দিল্লীর তক্তে রাহুল গান্ধীকে বসাবার কী তীব্র বাসনা নিয়ে তিনি কংগ্রেসকে জোট সঙ্গী করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চাকরিটা তিনি নিজের জন্যই ভেবে রেখেছেন। কিন্তু এই লাভালাভের তুলমূল্য হিসেবে কি আঞ্চলিক দলগুলির আসন সংখ্যা হিসেব করা, পণ্ডিতেরা, কি কংগ্রেসের এক সংখ্যার আসন জয়ের হিসেব রাখা প্রজ্ঞাবানরা উভয়েই ভুলে যাচ্ছেন যে ল্যাজ কুকুরের মাথাকে নাড়াবার অনেক আগেই ওই ল্যাজ থেকে দুরারোগ্য সংক্রমণ ঘটবে সারমেয়টির শরীরে।

এই জোট বাঁধার ধাঁধায় সদ সমাপ্ত নির্বাচনে যে ‘চমৎকার’ ঘটে গেল তাতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়া পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদীরা ও তামিলনাড়ুর ডিএমকের নেতারা ভাবছেন রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধলে দুই আর দুই-এ চার না হয়ে ফলাফল বিয়োগান্ত হয়ে যেতে পারে। এখানে বলা জরুরি, আজকের কংগ্রেস দল তাদের দুর্নীতিতে চরম দক্ষতা দেখানোর ফলেই ধ্বংস হয়েছে শুধু নয় একটি অবসন্ন পারিবারিক শাসনকে জিইয়ে রাখার উগ্র বাসনায় তারা আজকের সম্পূর্ণ ভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে চলা ভারতে তাদের প্রাসঙ্গিকতাই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের প্রসঙ্গ উঠলেই জাতির শরীরে নেতিবাচক লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এই যোগ বিয়োগের কারিকুরিটা একনজরে তামিলনাড়ু নির্বাচনী ফলের দিকে তাকালেই পরিষ্কার হবে। এটা অনেকেরই হয়ত নজরে পড়েনি। ডি এম কে নির্বাচনে ১৭৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জেতে ৮৯টি আসন অর্থাৎ অর্ধেক বা ৫০ শতাংশ। অন্যদিকে জোটসঙ্গী কংগ্রেস লড়েছিল ৪১টি আসনে জেতে ৮টি। জয়ের শতাংশ ১৫। সংখ্যাতত্ত্ববিদ না হয়েও বলা যায় যদি ডিএমকে এই আসনগুলিতে লড়ে তাদের সাফল্যের গড় ধরে রাখত সেক্ষেত্রে তাদের আসনসংখ্যা নিদেনপক্ষে হোত ১০৯। ভোট বাজারে ডিএমকে-র যে সাফল্য দেখা গেছে সংখ্যাটা বাড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। আদতে দেখা গেল কংগ্রেসকে আসন ছেড়ে করুণানিধি আসলে জয়ললিতার হাতেই আসন উপহার দিয়ে গেলেন।

একটু নজর করলেই দেখা যাবে কংগ্রেস না থাকলে ডিএমকে-র বর্ধিত আসন সংখ্যার নিরিখে তামিলনাড়ু বিধানসভায় দু’দলে হোত আরও ‘কাঁটে কি টক্কর’। ৫ বছরে অনেক সম্ভাবনাই খোলা থাকত। কিন্তু হলোটা কী? নবতিপর পারিবারিক দলপতি করুণার শেষবারের আসা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আর এর কারণ হলো তাঁর পরিবারের সদস্যরা না বুঝে শুনে দিল্লীতে বোনা কংগ্রেসের মিথ্যে স্বপ্নজালকে বিশ্বাস করলেন। এরই বিপরীতে দেখুন মমতা ব্যানার্জীকে যিনি ঠিক সময়মত কংগ্রেসকে ঘাড় থেকে

নামিয়ে দেওয়ার ফলে একলা চলে বিপুল সাফল্যের মুখ দেখলেন। আর অসমের বদরুদ্দিন আজমলের সঙ্গে (AIDUF) কংগ্রেস জোট বাঁধতে গররাজি হওয়ায় কিছু সিট কমলেও বেঁচে গেলেন।

ফলাফল পর্যালোচনা করলে নিমতেতো সত্য যেটা উঠে আসছে,তা হলো, বঙ্গ সিপিএম তাদের এই নির্জলা নীতিহীন জোট করার ফলে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কমিউনিস্টদের এই ধ্বংসলীলায় নিরপেক্ষ বা পুরোপুরি মার্কসবাদী আদর্শে দায়বদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলীর তাদের ছেড়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা দিল্লী থেকে পার্টি সম্পাদক ইয়েচুরির একটি জন্মসূত্রে বিষমজোট তৈরির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে যায়। একই সঙ্গে ইয়েচুরি ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার পর ১৯৬৭-র বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের ৪৩টি আসনের রেকর্ডকে এবারে ২৬-এ নামিয়ে এনে দলকে অর্ধশতাব্দী পশ্চাৎমুখী করার শ্মশান-ঋত্বিকের কাজ করেছেন।

কিন্তু একবারও পূর্বাপর ভেবেছেন কি কেন এমন হলো? হারায় হোক বা জেতায় হোক, সকলেই জানেন বাংলার সিপিএম দল কংগ্রেসের সঙ্গে কখনও আপোশ করেনি। হায়! এই ফলাফলের পর তাদের হাতে আর এমন কিছুই পড়ে নেই যার জন্য আপোশ করা যায়।

আজকের ভারতীয় ভোটার তার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে ফেলেছে। সেটি হলো উন্নয়ন। আর এই উন্নয়নের চরিত্র সবচেয়ে সহজ কথায় বলেছেন নরেন্দ্র মোদী— 'সবার জন্য উন্নয়ন'। দেশের সমস্ত প্রান্তের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে একটিই সংকেত আসছে 'উন্নয়ন চাই'। যুক্তিহীন আবেগ বা উত্তেজক কোনো মন্ত্র শোনানোর রাজনীতি আজ অতীত, আর তা চালাতে গেলে বুমেরাং হয়ে যেতে পারে।

যে সুইং ভোটাররা ভোটের ফলাফল নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা নেন তাঁরা এখন প্রার্থী ধর্মের পক্ষে না বিপক্ষে এটা জানতে যতটা উৎসাহী তার চেয়ে ঢের বেশি উৎসাহী প্রার্থী গরিবের পক্ষে না বিপক্ষে। প্রার্থীর কোনো বাস্তব ধারণা আছে কিনা গরিবদের জীবন ধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে। প্রার্থী গরিবদের বঞ্চনা নিরসন করতে কতটা আন্তরিক। সেই প্রার্থী কি বুঝতে পারেন যে গরিবরা দশকের পর দশক ব্যাঙ্কের চৌকাঠ পেরোতে কতটা ভয় পেত। একজন মা তাঁর রান্নাঘরে যুগান্ত ধরে যে ধোঁয়ার জালে আবদ্ধ হয়ে তাঁর শরীর ক্ষয়িয়ে ফেলছেন তাঁর কাছে একটা গ্যাস সিলিন্ডার কতখানি জীবন পরিবর্তনকারী ত্রাতা। সঙ্গে তারা এটাও বিচার করে প্রতিশ্রুতিকে কাজে পরিণত করার কতটা দম প্রার্থীর আছে। সে কি পারবে একটা কুঁড়েকে ঘরে বদলে দিতে? পায়ে হাঁটা মানুষকে কি দিতে পারবে একখানা সাইকেল? এমনই সব রূঢ় বাস্তবের দৈনন্দিন রক্তক্ষরণ বন্ধ করার দম আজ পরীক্ষার মুখে।

এটা বুঝলে সম্পূর্ণ ভুল হবে যে সরকারের সাফল্য শুধু বিনি পয়সায় উপঢৌকন দেওয়ার ওপরই টিকে থাকে। উল্টে গরিব মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান সুশাসনের মাধ্যমে নিত্য পরিবর্তন ও উচ্চাশা সৃষ্টির ওপরই তার সাফল্যের যথার্থ মূল্যায়ন হয়।

গণতন্ত্রের প্রবহমাণ প্রক্রিয়া শাসক বিরোধী উভয়ের কাছেই নিত্য নতুন সুযোগ আনে। পরিষ্কার করে বললে বলতে হবে মোদীর সরকারকে মান্যতা দিতে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গোড্ডা বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এর ফলে ভারত উল্টে না গেলেও পর্যালোচনা দরকার। বিহারের পরাজয়ের পর মুসলমান অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে লালু যাদবের আর জে ডি প্রার্থী যিনি অন্য সব বিজেপি বিরোধীদের সমর্থনে লড়েছিলেন তাঁকে আগের থেকে বেশি ভোটে দল হারিয়েছে। লক্ষণীয়, মুসলমান অধ্যুষিত ৬৯ নং ব্লকটিতে বিজেপি পেয়েছে ১৪৮০০ ভোট, বিরোধীরা ১৩৪৫৭। এমন ফলাফল অতীতে কখনও দেখা যায়নি।

তাই হাওয়ায় যেমন বৃষ্টির গন্ধ থাকে ঠিক তেমনি দেশে কিছু একটা ঘটছে। 'উন্নয়ন, সকলের জন্য উন্নয়ন' —এই মর্মবাণীটি সফলকে সচকিত করছে। ভারতে এক নতুন আখ্যান লেখা শুরু হয়েছে। নতুন বীজ দেশ্যব্যাপী রোপিত হয়েছে। এখন কিছু অপেক্ষা। ■

HOW ₹1000 SIP CAN GROW IN A LONG TERM!!

Year	5	10	15	20	25	30
Total Amt.	60,000	1,20,000	1,80,000	2,40,000	3,00,000	3,60,000
8%	77,172	201,458	401,621	723,987	1,243,160	2,079,293
12%	81,104	224,036	475,931	919,857	1,702,207	3,080,973
15%	87,342	263,018	616,366	1,327,079	2,756,561	5,631,770
20%	98,704	344,311	955,460	2,476,194	6,260,267	15,676,252

Fights Market Volatility

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

CALL TODAY AND START SIP INVESTMENT

uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A PARTNER FOR LIFE
Mutual Fund Investment Subject to Market Risk.

ভূ-জ্বর সারাতে কবিরাজ 'সূর্য'

ড. ধনঞ্জয় রায়

আধুনিক সভ্যতার আবশ্যিক উপাদানটি হলো বিদ্যুৎশক্তি, যার সিংহভাগ আসে জীবাশ্ম জ্বালানি কয়লা ও তেল পুড়িয়ে। সভ্যতা- বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে মাটির তলা থেকে বিপুল পরিমাণে কয়লা ও তেল তুলে এনে পুড়িয়ে প্রয়োজনের বিদ্যুৎশক্তি ও কারখানার তাপশক্তির জোগান দেওয়া চলছে। নতুন কয়লা ও তেল সৃষ্টি করা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই দ্রুত সঞ্চয় ফুরোচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, সভ্যতার

অন্যগতির চাকা কী স্তব্ধ হয়ে যাবে? আমাদের কি বৈদ্যুতিন নগর-সভ্যতা ছেড়ে হ্যারিকেন বা মোমবাতির গ্রামীণ-সভ্যতায় ফিরে যেতে হবে?

দ্বিতীয়ত, জীবাশ্ম জ্বালানির দহনকালে কার্বন, সালফার ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশছে। জীবকুলের প্রাণদায়ী অক্সিজেন সরবরাহকারী বায়ুমণ্ডল ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ হয়ে উঠেছে জীবকুলের প্রতিকূল।

তৃতীয়ত, একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য করলে কিংবা সংবাদমাধ্যমের সাহায্য নিলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারব যে অতীতে সময়সূচি মেনে যেভাবে প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন— বৃষ্টিপাত, ঝড়, ঋতু পরিবর্তন ঘটত তা কিন্তু বর্তমানে ঘটছে না। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঝড়-ঝঞ্ঝার আধিক্য বা তীব্রতা বৃদ্ধি, দিনের তাপমাত্রার খেয়ালখুশি ওঠা-নামা ঘটে চলেছে। অতীতের নিয়ম বা প্রথা ভাঙা যেন আজকের প্রকৃতির কাছে দস্তুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন এমন হলো?

ইদানীংকালে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা (অতীতের ১৪° সেন্ট্রিগ্রেড) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হচ্ছে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'। বাতাসে অতিরিক্ত পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ৫০ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর যে তাপমাত্রা (১৪° সেন্ট্রিগ্রেড) স্থির ছিল তা কেবলমাত্র ১০০ বছরে ০.৮° সেন্ট্রিগ্রেড বেড়ে গেছে। সামান্য এই তাপমাত্র বৃদ্ধিতে পৃথিবীর বুকে পরিবর্তনের ধুম লেগে গেছে। বিজ্ঞানীরা এর জন্য দায়ী করেছেন মানুষের ক্রিয়াকলাপকে। তাই অধিকতর উষ্ণায়ন ঠেকাতে এখনই জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

কাজেই ভাঁজ পড়েছে বিজ্ঞানীদের কপালে। শুরু হয়েছে বিকল্প (Non-Conventional) শক্তির সন্ধান। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এমন এক বিদ্যুৎ শক্তির উৎস যা হবে স্থায়ী (অন্তত দীর্ঘস্থায়ী) এবং দূষণমুক্ত।

বিকল্প শক্তির উৎসের তালিকায় সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রথমে উঠে আসবে পারমাণবিক শক্তি। হ্যাঁ, পারমানবিক শক্তি এককভাবে পারে বর্তমানের বিপুল চাহিদার বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দিতে। প্রত্যেক বস্তু অতি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কণা পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই পরমাণুকে ভেঙে আইনস্টাইনের ভরশক্তি সূত্র ($E = mc^2$, E = শক্তি, M = বস্তুর ভর এবং C = আলোর বেগ) অনুযায়ী খুব অল্প পরিমাণ ভর থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের বিস্তর সমস্যা রয়েছে। পরমাণুর (প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর কেন্দ্রক নিউক্লিয়াস) ভাঙনকালে এক অতি তেজস্ক্রিয় (গামা) রশ্মি নির্গত হয় যা জীবদেহের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। দ্বিতীয়ত, এই রশ্মির প্রভাবে পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসপত্র এবং বর্জ্য পদার্থ তেজস্ক্রিয় হয়ে যায় যা আবার পরিবেশে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়াতে পারে। তাই এগুলির যথাযথ সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এখনও পর্যন্ত এর সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি বের করা যায়নি। বর্তমানে বড় বড় লেড-কনটেনারে এইসব তেজস্ক্রিয় বস্তু ভরে গভীর সমুদ্র বক্ষে অথবা ভূ-গর্ভে ডাম্পিং করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো পদ্ধতিই নিরাপদ নয়। প্রথম ক্ষেত্রে সমুদ্রের ইকো-সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর তেজস্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করতে গিয়ে সমগ্র জীবকুলের বিনাশ ডেকে আনা হবে। ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনে চেরনবিল পারমাণবিক চুল্লীর দুর্ঘটনার ফলে চুল্লীর থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে মানুষ তথা

প্রাণীকুল এখনও যেভাবে নানা শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত হচ্ছে তা দেখে এখনই আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। তাই গবেষণা চলছে বিপদ ও দূষণমুক্ত পুনর্নবীকরণ যোগ্য বিকল্প শক্তির সন্ধানে। এরকমই কয়েকটি বিকল্প শক্তির উৎস হলো— বায়ু বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, তরঙ্গবিদ্যুৎ, জৈব-ভর ভিত্তিক বিদ্যুৎ ইত্যাদি।

প্রতিটি উৎস থেকে অল্প বিস্তর কিছু বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হলেও প্রতিটি উৎসের উৎপাদন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অনিয়মিত বায়ু প্রবাহ ও তীব্রতা বায়ু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন গড় আবর্জনার পরিমাণের হেরফের জৈব-বিদ্যুতের ক্ষেত্রে, সমুদ্রের উচ্চতার পরিবর্তন তরঙ্গ-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে সীমাবদ্ধতা এনেছে।

এই সকল পদ্ধতি মিলিয়ে অল্প কিছু পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করা গেলেও সব মিলিয়ে কিন্তু সিন্ধু পরিমাণ চাহিদায় কিছু পরিমাণ জোগান। তাহলে কি অনাগত সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য দিন গোনা ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু নেই? কিছু নেই যে—সেকথা এখনই যেমন বলা যাচ্ছে না, তেমনি কিছু যে আছে সেকথাও সঠিকভাবে বলবার সময় এখনও আসেনি। যাকে ঘিরে আমাদের আশা-ভরসা আবর্তিত হচ্ছে তা হলো 'সৌরশক্তি'। কবি কবিতার ছত্রে যে অভয় দিয়ে গেছেন, "মেঘ দেখে কেউ করিস না ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে..." তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে মানুষের সেবাশক্তি ও উন্নত টেকনলজিকে কাজে লাগিয়ে। সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে তাড়ব তাবড় বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন কীভাবে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা যায়।

সূর্যকে নিয়ে কৌতূহল বা বিস্ময় কেবল আজকের নয়, প্রাচীনকালেরও। মানুষ প্রত্যেক প্রত্যুষে ঘুমভাঙা চোখে বিস্ময়ে দেখেছে রাতের অন্ধকার শেষে সূর্যের উদয়। প্রতি রাতের অন্ধকারকে তাড়িয়ে প্রত্যুষে সূর্যের নিঃসংশয় উদয় অন্ধকার ভীরু, দুঃস্বপ্নকাতর, গুহাচারী মানুষের জীবনে দিয়েছে বাঁচার ভরসা। এনেছে জীবনের প্রতি বিশ্বাস। সূর্য তাই ছিল মানুষের জীবনে বিজয় ও সত্যের প্রতীক। অন্ধকারের গ্রাস থেকে সূর্যই যেন ত্রাণ করে এই জীবন। তাই 'এ জীবন সূর্যের দান'— কথাটা বিশ্বের প্রায় সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই ধ্বনিত হয়েছে। তাইতো ত্রাতার প্রতি ভক্তিনম্র কৃতজ্ঞ চিত্তের অঞ্জলি—

—ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

হে তমোনাশক, সর্বপাপহারী সূর্যদেব, তোমাকে প্রণাম।

আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়েছে, এ জীবনে সূর্যের ভূমিকা কেবল অনুভবের ত্রাতারূপে নয়, প্রস্তুতকর্তা রূপেও। ১৭৭৯ সালে ডাচ পদার্থবিদ জন ইন্‌জেন-হাউজ দেখালেন যে উদ্ভিদরা তাদের সবুজ পাতার ক্লোরোফিল নামক কণার সাহায্যে সূর্যের আলো শোষণ করে, শুধুমাত্র প্রাণীর প্রাণঘাতী কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং জল দিয়ে সালোকসংশ্লেষ নামক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবকুলের প্রাণধারণের উপযোগী শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। অতিক্ষুদ্র কয়েকটি প্রাণী ছাড়া মানুষ-সহ সমস্ত প্রাণীকুল কোনো না কোনো ভাবে উদ্ভিদের থেকে এই খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। ফলে খাদ্যের জন্য এই পৃথিবীর জীবজগৎ সূর্যের ওপর নির্ভরশীল। আবার বহুকাল আগে কোনো এক প্রাকৃতিক কারণে তৎকালের উদ্ভিদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কয়লা এবং প্রাণীর দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল। তাই এদেরকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি। এই জীবাশ্ম জ্বালানিই হলো আজকের আধুনিক হাই-টেক সভ্যতার আবশ্যিক উপাদান। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই বংশবৃদ্ধির জন্য তাপের প্রয়োজন। মহাশূন্যে ভাসমান এই পৃথিবীতে তাপের মূল উৎস হলো সূর্য। সূর্য থেকে আগত তাপ পৃথিবীপৃষ্ঠের সব জায়গা সমানভাবে উত্তপ্ত করে না। তাই যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণের কম তাপ পাওয়া যায় সেখানে গ্রিন হাউস এফেক্ট নামক একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তাপ সূর্যের আলো থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

ফলে দেখা যাচ্ছে, এই পৃথিবীর কীভাবে সৃষ্টি হলো তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও পৃথিবীতে সৃষ্ট জীবজগৎ ও তার সভ্যতার বিকাশ সবই সূর্যের দান। পৃথিবীর বুকে জীবের সৃষ্টির ২০০ কোটি বছরের পর থেকে প্রায় ৬০ কোটি বছর জীবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বংশবিস্তার— সবার পেছনেই আছে সূর্য। জীববিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জানাচ্ছেন যে এই ৬০ কোটি বছরে মাত্র পাঁচবার পৃথিবীর বুক থেকে জীবের অবলুপ্তি ঘটেছে (দ্রষ্টব্য : Elizabeth Kolbert–The Sixth Entinction)। তবে পাঁচবারই ছিল প্রাকৃতিক কারণে। এই প্রথমবার জীবের হয়তো অস্তিত্ব সঙ্কট দেখা দেবে মানুষের কারণে। একেই বলে 'নিজের পায়ে কুড়াল মারা'। প্রকৃতির পরিবর্তনের স্বাভাবিক ধারাকে মূল্য না দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তার বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে টেকনোলজির উন্নতি ঘটিয়ে জীবনের অগ্রগতি ও বিলাসিতার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্রুত তৈরির তাগিদে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে একসঙ্গে দুটি সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাইতো ৬০ কোটি বছর ধরে যে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল তা মাত্র ১০০ বছরে প্রায় ১°C বেড়ে গেছে। এটাই অশনি সঙ্কেত।

স্বীকার করা ভাল, মানুষ তার বুদ্ধির বড়াই করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে। সূর্য কি মানব সভ্যতার এই দুর্দিনে মুখ ফিরিয়ে নেবে? বস্তুত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণেরও সূত্র। সৌরশক্তির মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে বিদ্যুৎশক্তির সম্ভাবনা। দেরিতে হলেও বিজ্ঞানীরা এই অতিরিক্ত শক্তির জোগান দেওয়ার জন্য সূর্যের কাছে দরবার করবেন। সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরির চেষ্টা শুরু হয়েছে।

আলোকশক্তি যে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তা প্রথম পরীক্ষাগারে দেখেছিলেন ১৮৩৯ সালে বিজ্ঞানী বেকয়রেল (Becquerel)। তারপর দীর্ঘ দেড়শো বছরের পরিক্রমায় আজকে জানা গেছে যে অর্ধপরিবাহী কিছু পদার্থ (গ্যালিয়াম, সিলিকন, জারমোনিয়াম) আলোকশক্তিকে সরাসরি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে। যে যন্ত্র এই কাজ করে তাকে বলে 'সৌর কোষ'। সৌরকোষ তৈরির জন্য প্রয়োজন এইসব অর্ধপরিবাহীর ত্রুটিযুক্ত 'কেলাসিত রূপ'। সমস্যা এখানেই। যে অসংখ্য ছোটো ছোটো কণার সমন্বয়ে বস্তু গঠিত তাদের পারস্পরিক বিন্যাস দেখে বোঝা যায় কে কত ত্রুটিমুক্ত। কেলাসিত পদার্থের কণাগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজানো থাকে বলে এরা ত্রুটিমুক্ত হয়। তাই এই সব পদার্থের

আলোকশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করার ক্ষমতা বেশি। কিন্তু অ-কেলাসিত পদার্থের মধ্যে কণাগুলো শৃঙ্খলাহীন ভাবে অবস্থান করে বলে এরা ত্রুটি যুক্ত হয়। ফলে এদের আলোকশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের ক্ষমতা কম। তাই সৌরকোষ বানানোর জন্য অতি ব্যয় সাপেক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে অ-কেলাসিত পদার্থকে কেলাসিত পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়। দেখা গেছে, একটি সৌরকোষ বানাতে যে খরচ পড়ে তার ৬০ শতাংশ খরচ হয় পদার্থগুলিকে ক্রিস্টালাইজ করতে। এই জন্য সৌর বিদ্যুতের দাম কয়লা পুড়িয়ে উৎপাদিত প্রচলিত বিদ্যুতের দামের বেশ কয়েকগুণ।

এছাড়াও কেলাসিত পদার্থ দিয়ে তৈরি সৌর কোষের ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে দুটি বাধা রয়েছে : (১) বেশি উৎপাদন খরচ, (২) আলো শোষণ ক্ষমতা কম। তাই উৎপাদনও কম। সূর্যের আলো থেকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও তার ব্যাপক বাণিজ্যিক ব্যবহার করতে গেলে চাই উৎপাদন খরচ কমানো এবং পাশাপাশি বেশি আলো শোষণের ব্যবস্থা করা। এই দুটি সমস্যার সমাধানে সাম্প্রতিককালে (তাও প্রায় দু' দশক ধরে) শুরু হয়েছে এক ভিন্ন ধরনের গবেষণা। প্রকৃতিতে আলোক সংবেদনশীল অর্ধপরিবাহী পদার্থগুলো অ-কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায়। আবার দেখা গেছে অ-কেলাসিত অবস্থায় আলো-শোষণ ক্ষমতা বেশি। তাই বর্তমানে অ-কেলাসিত পদার্থ দিয়ে সৌরকোষ বানানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু গঠনগত কারণে অ-কেলাসিত অবস্থায় পদার্থগুলো বেশি ত্রুটিযুক্ত হয়। ফলে আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করার ক্ষমতা কম। তাই এই দুই প্রান্তীয় পদার্থের অন্তবর্তী কোনো পদার্থ যা পুরোপুরি কেলাসিত নয়, আবার অ-কেলাসিতও নয়— এমন পদার্থ দিয়ে সৌর কোষ বানিয়ে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর কতটা অর্থানুকূল তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সিলিকনের পলিক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি কোষ কেলাসিত এবং অ-কেলাসিত সিলিকন কোষের চেয়ে অর্থানুকূল। তাই বর্তমানে সিলিকনের পরিক্রিস্টালাইন কোষ দিয়ে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন চলছে।

> **“ধীরে হলেও আমরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছি এমন এক সভ্যতার দিকে যেখানে সূর্যই হবে শেষ কথা, নাম তার ‘সৌরসভ্যতা’। ”**

সরকারের ভরতুকি দেওয়া তাপ-বিদ্যুতের দামের তুলনায় সৌরবিদ্যুতের দাম বেশি। তাই সস্তার তাপবিদ্যুৎ ফেলে খরচবহুল সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রতি মানুষের অনীহা দেখা গেছে। বর্তমানে বড় বড় প্লান্ট বসিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ তৈরি করে Grid-এর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্যুতের দাম তাপবিদ্যুতের কাছাকাছি। গ্রিড-সিস্টেমে ব্যয়বহুল ব্যাটারি সংযোগের প্রয়োজন হয় না। তাই এর দাম কমে যায়। কিন্তু rooftop সৌরবিদ্যুতের দাম এখনও বেশ বেশি। অর্ধপরিবাহীর (Semi-conductor) উপর সৌর আলো পড়লে বিদ্যুৎ সৃষ্টিকারী অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রন ও হোল্ তৈরি হয়। সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি বা storage ব্যাটারিতে পৌঁছনোর পূর্বে এরা পদার্থগলিতে শোষিত হয়ে যায়। তাই বিদ্যুৎ কম হয়। এই পদ্ধতি ভীষণই সূক্ষ্ম। তাই এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ অতি মূল্যবান। এই সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে ফ্যাশান করার জন্য বাড়ি আলোকিত না করে এর উপযুক্ত ব্যবহার করে অপচয় বন্ধ করা উচিত। সৌরবিদ্যুৎ কিন্তু তাপবিদ্যুতের মতো সঞ্চিত শক্তি নয়। সৌর কোষ হলো একটা Technology বা কৌশল। তাপবিদ্যুৎ যত বেশি ব্যবহার করা হবে ততই এর দাম বাড়বে। দাম কমবে সৌরবিদ্যুতের।

সূর্য একটি অফুরন্ত আলো ও তাপের উৎস এবং প্রত্যেক প্রত্যুষে তার উদয় একটি চিরসত্য ঘটনা। গণনায় দেখা যাচ্ছে সূর্য থেকে এই পৃথিবীতে এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ আলোকশক্তি আছড়ে পড়ছে তা সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয় তার থেকেও বেশি। আবার সৌরকোষ কোনোভাবেই দূষণ ছড়ায় না। তাই এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ তৈরির কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। এমন একটা সময় আসবে যখন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুতের দামটা আর বিচার্য হবে না। আমাদের মনে পড়বে স্বনামধন্য ভারতীয় বিজ্ঞানী ড. এইচ. জে. ভাবা-র উক্তি— ‘No power is costlier than no power’। আশার কথা, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ High-priority দিয়ে সৌরবিদ্যুৎ তৈরিতে মন দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সৌরকোষের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন—সৌর-কোষকে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক মহাকাশ গবেষণার কাজে ব্যবহৃত মহাকাশযানে, যার সাহায্যে মানুষ গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার কথাও ভাবছে। পৃথিবীর চারপাশে ঘূর্ণায়মান কৃত্রিম উপগ্রহের সর্বশেষ চমকপ্রদ ব্যবহার হলো ইন্টারনেট ও রিমোর্ট সেনসিং, যা ঘরে বসে পৃথিবী দর্শনের সুযোগ এনে দিয়েছে। মহাকাশযানে বহু বছর ধরে বিদ্যুৎশক্তি জোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জীবাশ্ম জ্বালানি ভারের কারণে পাঠানো সম্ভব নয়। তাই এই সব হাল্কা সৌরকোষকে ব্যবহার করে সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করে কাজে লাগানো হচ্ছে। আরো ব্যবহারের প্রসার ও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতর কোষ তৈরির গবেষণা চলছে। তাই মনে হচ্ছে ধীরে হলেও আমরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছি এমন এক সভ্যতার দিকে যেখানে সূর্যই হবে শেষ কথা, নাম তার ‘সৌরসভ্যতা’।

(৫ জুন পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

(লেখক বারাসাত গর্ভ: কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক)

বিভাজনের রাজনীতি আজও চলছে

বিমলকৃষ্ণ দাস

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছিল সর্বজনবিদিত। আশা ছিল শান্তি আসবে; কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা কী পেয়েছি— একথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। হিন্দুরা শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তানেই অত্যাচারিত তা নয়, খোদ ভারতেও কিছু রাজনীতিকের পেশাদারী নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আজ ক্ষয়িষ্ণু, অবহেলিত, ব্রাত্য। এসব কথা এজন্য বলা— ১৯৪৭-এর আগে রাজনীতির আসরে একশ্রেণীর নেতার মুখে যে ভাষা, যে সুর শোনা গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের বাজারে আবার সে সুর প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যাচ্ছে। কেউ খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন— ''আমরা কোনো রাজনৈতিক দলকেই তোয়াক্কা করি না। দরকার হলে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে কলকাতায় ফাইনাল খেলা খেলে দিতে পারি।'' কেউ ২৭ শতাংশ-এর কথা বুঝিয়ে দিলেন। ভোটের ফলাফলে তাদের আস্ফালনই স্বীকৃতি পেল। মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা হারে ১৯.৮৫ (১৯৫১) থেকে আজ ২৭-এ পৌঁছেছে (২০১১)। শতকরা ৭.১৫ বৃদ্ধি। সেখানে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে ৭.৯১ শতাংশ। অবাধ অনুপ্রবেশ ও পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিন্তে বসতি স্থাপন। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সার্বিক আপোশনীতি ও ক্ষমতা লিপ্সার গলিতে অন্ধবিচরণ। ভোটের পূর্বে কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের এক নামকরা প্রাক্তন আই. পি. এস. অফিসার ঘোষণাই করলেন— 'মুসলমান ভোট ছাড়া সরকার গঠন সম্ভব নয়'। শাসকদলের প্রতি তার অভিযোগের বিশাল ফিরিস্তি— 'সংখ্যালঘুদের জন্য এই সরকার কিছুই করেনি, দশ হাজার মাদ্রাসা তৈরির কথা ছিল— হয়েছে মাত্র ২৩৫টা।' অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগে বিভিন্ন জনসভায় সংখ্যালঘুদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, গার্লস হস্টেল, স্কলারশিপ, মৌলবিভাতার মতো কত উদাহরণ তুলে ধরেছেন। কিন্তু এতসবেও সেই আই পি এস (প্রাক্তন) অফিসার নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়নি। দশ হাজার মাদ্রাসা কেন হলো না, মাত্র ২৩৫ টা কেন? স্বাভাবিক প্রশ্ন— মাদ্রাসা ছিল কত? ২০১৪-র 'ইন্ডিয়া টু ডে'-র হিসেবে পশ্চিবঙ্গে অনুমোদিত মাদ্রাসা ছিল ৫০০, চার হাজার ছিল অনুমোদনের অপেক্ষায়। প্রশ্ন হলো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কী বিশেষত্ব যা সাধারণ বিদ্যালয়ে সম্ভব নয়! বিশেষ উন্নত কিছু হলে তা তো সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। একটি নতুন বিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রেও এই একই শাসনে এগুলির জন্য আলাদা ছাড়। স্কুল পরিচালনার নিয়মেও পার্থক্য। আর যদি এখানে একান্ত ধর্মীয় কোনো বিষয় থাকে তবে তো তা নিয়ে প্রশ্ন আসবেই। এতে বিভাজনের রাস্তা খুলে যায়। কোনো সম্প্রদায়, কোনো জাতি, কোনো ধর্মের নামে বিশেষ সুযোগ নয়, সুযোগ থাকা উচিত সমস্ত অনগ্রসর, দুর্বল, অভাবগ্রস্ত সকলের জন্য সমান। তবেই আমরা পরস্পর বিদ্বেষমুক্ত হতে পারবো।

আর একটি স্লোগান ২০১৪ পরে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। —'দলিত-মুসলিম একতা'। প্রাক্তন আই পি এস অফিসার মহোদয়ের কাজও এই পথেই। ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করে দুর্বল করার যে নানা শিল্পকর্ম বিদেশি কূটচক্রী সহযোগে চলছে— এ হলো তার এক নতুন সংস্করণ। এতে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রতিশোধ নেওয়া হবে। পরিকল্পনা সার্থক হবে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ গঠনের, সার্থক হবে ভারতবর্ষকে বহু টুকরো করার চীনা পরিকল্পনা। এমনিতে কিছুদিন আগে শুনলাম সন্ত্রাসবাদী ইয়াকুব, আফজল গুরুর হয়ে স্লোগান— 'কাশ্মীর কি আজাদি', 'অসম কি আজাদি', 'মণিপুর কি আজাদি' ইত্যাদি। ভারত টি টুয়েন্টি ম্যাচে হারলে মীরাটের পাশে এক গ্রামের মানুষ উল্লাসে ভারত-বিরোধী স্লোগান দিল। কাশ্মীরে দু'মাস ধরে এক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নানা সন্ত্রাসবাদীর নামে ১৬টি দলের খেলা চালান হয়। এই অবস্থার মধ্যে দেশ জুড়ে চলছে সম্প্রদায়, জাতপাত সংরক্ষণ নিয়ে শুধু বিভেদের রাজনীতি। দলিত, অস্পৃশ্যতা, উঁচু জাত, নীচুজাত— এ হিন্দু সমাজের অভিশাপ। আর জাতপাত অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই তা কিন্তু নয়। আমাদের প্রয়োজন এই অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ খোঁজা। পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে পরস্পরের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস সৃষ্টি করা কোনো শুভ বুদ্ধির পরিচয় নয়। স্বাধীনতার পূর্বে এমন প্রয়োগ ও তার করুণ পরিণতির কাহিনি আমরা সকলে জানি। স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন তথাকথিত দলিত তপশিলি জাতির অবিসংবাদী নেতা। জিন্নার সহযোগী হয়ে তিনি মুসলিম লীগের হয়ে বিভাজনের পক্ষে রায় দেন। দেশভাগের পরে তিনি থাকলেন পাকিস্তানে (করাচী)। লিয়াকত মন্ত্রীসভায় আইন ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন (১৯৪৭-'৫০)। নাগরিকত্ব ছিল পাকিস্তানের। কিন্তু ১৯৫০ সালে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন তিনি। পাকিস্তান মন্ত্রীসভা ছেড়ে চলে আসার সময় তিনি যে পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে দিয়েছিলেন তা দলিত মুসলিম একতার বেদনাদায়ক পরিণতির এক উৎকৃষ্ট দলিল। প্রায় ১৬ পৃষ্ঠার এই চিঠির শুরুটা ছিল এই রকম— "My dear Prime Minister, it is with a heavy heart and a sense of utter frustration at the failure of my life long mission to uplift the backward Hindu masses of East Bengal that I feel compelled to tender resignation of my membership of your cabinet."--- এর পরে বিশ্বাসহীনতা, মিথ্যাচার, শক্তি প্রয়োগে ধর্মপরিবর্তন, নৃশংস হত্যা, অত্যাচারের অজস্র কাহিনি ও তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের বিশাল এক হতাশার চিত্র এই দীর্ঘ পত্রে তিনি তুলে ধরেন। সমস্ত কাণ্ডের সত্য ঢেকে কোনো মিথ্যা প্রতিবেদন তিনি তৈরি করতে পারবেন না— এই শেষ কথা লিখে লিয়াকত মন্ত্রীসভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বাবাসাহেব আম্বেদকরের অন্যতম অনুগামী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। অতএব এ পথ যে প্রকৃত পথ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ ভাল মানুষগুলিকে যারা বিপথগামী করে তাদের চিনতে হবে। সর্বাগ্রে আজ এই শুভবুদ্ধির জাগরণ প্রয়োজন। ■

সঙ্ঘের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভাবনীয় ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সদ্যই অসমে সরকার গঠন করেছে বিজেপি জোট। আর এরই মধ্যে এরকম একটি খবর। সঙ্ঘ পরিবারের স্কুল বিদ্যাভারতীর এক মুসলমান ছাত্র এবার অসমে মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

ছাত্রের নাম সরফরাজ হোসেন। ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৫৯০ পেয়ে সরফরাজ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিদ্যাভারতীর অধীনস্থ শিশু শিক্ষা সমিতি অসমে যে ক'টি স্কুল চালায় তারই একটি দক্ষিণ গুয়াহাটির বেটকুচি অঞ্চলের শঙ্করদেব শিশু নিকেতন। সরফরাজ এই স্কুলের ছাত্র। সে জানিয়েছে, 'এই স্কুলের ছাত্র হতে পেরে আমি গর্বিত। স্কুলের জন্যেই আমি ফার্স্ট হতে পেরেছি।' এরপর তার লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হবার প্রস্তুতি শুরু করা।

সরফরাজ হোসেন

কিন্তু সরফরাজ কি শুধুই এক ফার্স্ট বয়? একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিশোর? একেবারেই না। সরফরাজের কাহিনি মোটেই তেমন জোলো নয়। তার যুগপৎ ভালো এবং অসাধারণ ছাত্র হয়ে ওঠার পরিক্রমাটি যথেষ্টই রোমাঞ্চকর। সংস্কৃত গদ্য রচনায় তার জুড়ি মেলা ভার। সংস্কৃতে কথা বলতে পারে অনর্গল। এমনকী বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কারও পেয়েছে। আরও একটি পুরস্কার তার বাড়ির আলমারিতে নিত্য দৃশ্যমান। সেটি দু'বছর আগে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত গীতার শ্লোক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সেরা হবার শিরোপা। এত যার গুণ সে দিব্যি হাসতে হাসতে বলল, 'সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না। গায়ত্রী মন্ত্রও আমি পাঠ করি।' সরফরাজের এই স্বীকারোক্তিতে রয়েছে এই কাহিনির সব থেকে ইন্টারেস্টিং টুইস্ট! 'অসুবিধে' বলতে সে নিশ্চয়ই ভাষাগত সমস্যা বোঝাচ্ছে না। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতে একশোয় একশো পাওয়া ছাত্রের সেই সমস্যা থাকার কথা নয়। সে বলতে চাইছে অন্তরের বাধার কথা। হাজার হোক সে মুসলমান। তার সমাজ এবং ধর্মগুরুরা তাকে এ কাজের সম্মতি দেয়নি। সারাদেশে অনেকগুলি ডান-বাম রাজনৈতিক দলের ধর্মনিরপেক্ষতার ঢক্কানিনাদও বাধা সৃষ্টি করে। তবুও সরফরাজের কোনো 'অসুবিধে' হয় না।

এই 'অসুবিধে' না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন সরফরাজের বাবা আজমল হোসেন। বোঝা গেল আম গাছে আমই হয়, আমড়া হয় না। তাঁর মতে, 'অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন সঙ্ঘ পরিবারের স্কুলে ছেলেকে কেন পাঠালাম? আমার হাসি পায়। আরে ভাই সমস্যাটা কোথায়? আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন অসমীয়া। তাছাড়া, আমার মেয়েও তো ওই একই স্কুল থেকে তিন বছর আগে পাশ করেছে। মনে আছে, যেদিন মেয়েকে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলাম, প্রধান শিক্ষক জানতে চেয়েছিলেন, আমি কি এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করে নিয়েছি? তিনি জানিয়েছিলেন এই স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে হয়। গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করতে হয়। অংশ নিতে হয় সরস্বতী বন্দনায়। আমি রাজি হয়েছিলাম। কারণ আমি বরাবর ছেলেমেয়েকে এমন শিক্ষা দিতে চেয়েছি যার গুণগত মান সর্বোচ্চ পর্যায়ের এবং যা মানুষের চরিত্র গঠনের সহায়ক।' এখানে আজমল সাহেবের পেশাগত পরিচয় দেওয়া খুবই প্রয়োজন। তিনি গুয়াহাটির একটি হোটেলে ওয়েটারের চাকরি করেন!

একথা অনস্বীকার্য, এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যে ভণ্ডামি চলে তার মূর্তিমান প্রতিবাদ এই আজমল হোসেন ও তাঁর পরিবার। পরিবারটির শেকড় দরং জেলার পাথারুঘাট গ্রামে। যেখানে ১৮৯৪ সালে হিন্দু এবং মুসলমান চাষিরা একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তার সূত্র ধরে আজমল হোসেন বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি একসঙ্গে থাকতে পারে, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে পারে তাহলে আমি আমার সন্তানদের সঙ্ঘ পরিবারের স্কুলে পাঠাতে পারব না? আশ্চর্য! কই, খৃষ্টান মিশনারিদের স্কুলে যখন নানান ধর্মের ছেলেমেয়েরা পড়ে, যিশুর প্রার্থনায় অংশ নেয় তখন তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না।'

ন্যায্য প্রশ্ন! কিন্তু উত্তর পাওয়া তত সহজ নয়। যাই হোক, সরফরাজ যে স্কুলের ছাত্র এবার সেখানে যাওয়া যাক। শিশু শিক্ষা সমিতির প্রধান নির্মল বড়ুয়া বললেন, 'মাধ্যমিকে এর আগেও আমাদের বিভিন্ন স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা ভালো ফল করেছে। কয়েকবছর আগে বারপেটার একটি ছাত্র প্রথম ২০ জনের মধ্যে ছিল। মুসলমান ছাড়াও আমাদের স্কুলে বহু খৃষ্টান ছাত্রছাত্রী আছে। এবারে তাদের ফলও যথেষ্ট ভালো।' অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মলবাবু জানালেন, সমিতি-পরিচালিত২৩১টি স্কুলের মোট ৩৯ জন ছাত্র এবার মাধ্যমিকে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে আছে।

সরফরাজকে সাধুবাদ জানিয়েছে প্রশাসনও। অসমের নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী বিজেপির হিমন্তবিশ্ব শর্মা শীর্ষ স্থানাধিকারী ছাত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে, অসমের প্রত্যেকটা গ্রামে স্কুল গড়ার জন্য অনুরোধ করেছেন শিশুশিক্ষা সমিতিকে। তিনি বলেছেন, 'ছাত্রজীবনের একেবারে শুরুতেই ভারতীয় সংস্কৃতির বীজ বপন করা দরকার। তার জন্য প্রত্যেক গ্রামে এই ধরণের স্কুল স্থাপন করা উচিত। নয়তো শিশুমনের সঠিক বিকাশ সম্ভব হবে না।' ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

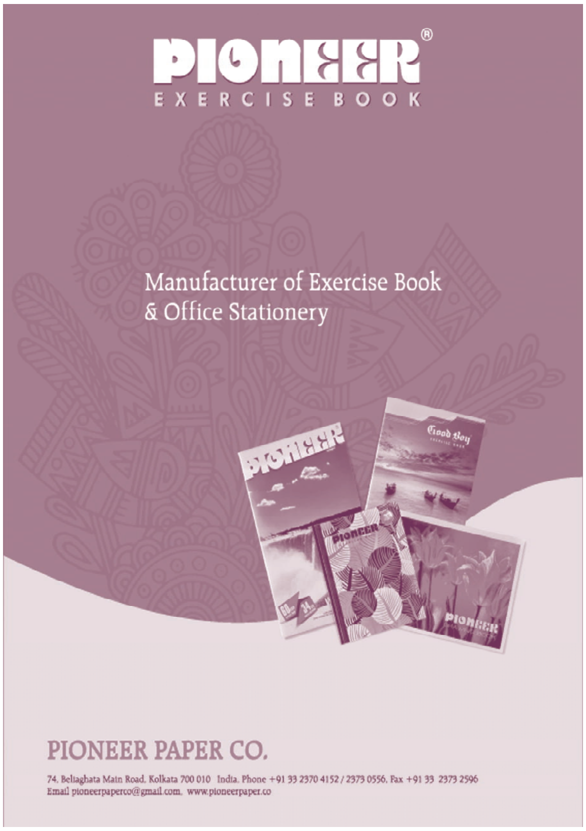

'দক্ষিণ ভারতের পারিয়া তার অতি সংক্ষিপ্ত পোশাকে মাদ্রাজের বীচ রোড ধরে হাল্কা গতিতে হেঁটে চলেছে— আহা! এই সৌন্দর্য ব্রোঞ্জের মূর্তিতে জগৎকে উপহার দেওয়া কতই না চিন্তাশীলতার পরিচায়ক! ঊষাকালে সমুদ্রতীরে উপাসনারতা নারী— আহা, মহান শিল্পী Millet-এর মতো যদি এ দৃশ্য চিত্রে রূপায়িত করা যেত! ভারতীয় শাড়ির অনুপম মাধুর্য, গ্রাম ও মন্দিরের শান্ত, স্নিগ্ধ জীবন, গঙ্গার তীরে শান্তভাবে মানুষের গমনাগমন, শিশুদের খেলা, গাভীদের শান্ত এবং শ্রমকালীন মুখচ্ছবি— আহা! একটি মাত্র পেন্সিল সহায়ে যদি এইসব অনুপম সৌন্দর্য প্রকাশ করা যেত!'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

অস্টিওআর্থারাইটিস ও হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ অস্টিওআর্থারাইটিস নামক দুরারোগ্য হাড়ের অসুখে আক্রান্ত। দেহের অত্যধিক ওজন বা স্থূলতা এই রোগের অন্যতম কারণ। রোগা ব্যক্তিরাও কিন্তু নিরাপদ নন। তাই ভয় না পেয়ে এই সমস্যা দেখা দিলে সঠিক চিকিৎসা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

□ অস্টিওআর্থারাইটিস কী?

তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ হলো হাড়ের রক্ষাকর্তা। কার্টিলেজ যখন দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে তখনই অস্টিও আর্থারাইটিস দেখা দেয়। যার ফলে ব্যথা, যন্ত্রণা-সহ একাধিক সমস্যা তৈরি হয়। হাড়ের জয়েন্টগুলিও তাদের স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা হারিয়ে ফেলে।

□ রোগের কারণ :

উচ্চতার অনুপাতে ওজন বেশি হয়ে গেলে, বয়সজনিত কারণে, খেলাধুলা কিংবা দুর্ঘটনা থেকে, হাঁটুতে সংক্রমণ থেকে অস্টিওআর্থারাইটিস হতে পারে। তাছাড়া বংশানুক্রমিক কার্টিলেজলস, জন্মগতভাবে হাড়ের বিকৃতি, মাত্রাতিরিক্ত স্ট্রেস, ধূমপান, মদ্যপানের মতো অভ্যাসেও এই রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার নির্দিষ্ট কিছু পেশার ক্ষেত্রে যদি কোনো জয়েন্টে বারবার চাপ পড়ে, তাহলেও এর প্রকোপ বেড়ে যায়।

□ কোন বয়সে হয় :

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণত গড়ে ৪৫ বছরের পর থেকে মহিলাদের এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫০ বছরের পর থেকে এই রোগটি হবার আশঙ্কা থাকে। তবে হাঁটুতে চোট লাগলে, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন বি-১২ ঘাটতি থাকলে কমবয়সেও এই সমস্যা শুরু হয়।

□ হাঁটু ছাড়া শরীরের কোন কোন অংশে হতে পারে :

এই রোগটি শরীরের যে-কোনো জয়েন্টে হতে পারে। তবে প্রধানত হাত, হাঁটু, কোমর, ঘাড়, নিতম্ব, কাঁধ, শিরদাঁড়া বা স্পাইনের উপর বেশি প্রভাব ফেলে। এছাড়া অন্যান্য জয়েন্ট, পেশীর নীচের হাড়, লিগামেন্ট, জয়েন্টের কভারেও এই রোগের প্রভাব দেখা দিতে পারে।

□ রোগের লক্ষণ :

প্রধান লক্ষণ হলো ব্যথা, যন্ত্রণা, ফোলাভাব অনুভূত হওয়া। চলাফেরার কষ্ট। হাড়ের স্টিফনেস, অনমনীয়তা দেখা যায়। হাঁটু নাড়াচাড়া করা যায় না। হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়, অনেক সময় আক্রান্ত জয়েন্টটি নড়াচড়া করলে মট্ মট্ আওয়াজ হয় ইত্যাদি। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণগুলি বাড়তে থাকে এবং জটিল আকার ধারণ করে।

□ ওজন কমাতে হবে :

ওজন বেশি হলেই এই রোগের ব্যথা জাঁকিয়ে বসে। ওজন বেশি হলে শরীরের চাপ গিয়ে পড়ে হাঁটু এবং পায়ের পাতার ওপরে। ওজন কমিয়ে ফেললে ব্যথার অনেকটাই উপশম করা যায়। অন্তত রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

□ এই রোগে যা বারণ :

অনেকক্ষণ দাঁড়ানো, ক্রসলেগ সিটিং এড়াতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা নিয়ম মেনে করতে হবে। সাধারণভাবে সিঁড়ি চড়লে হাঁটুর জয়েন্টে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তাই ওপরে ওঠার সময় রোগগ্রস্ত পা পরে এবং নীচের নামার সময় রোগগ্রস্ত পা প্রথমে ফেলতে হবে, যাতে শরীরের ভার রোগগ্রস্ত পায়ের উপর না পড়ে।

□ চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী রুটা, লিডামপল, ম্যাগফস, ক্যালকার্ব, আর্ণিকা প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ নির্বাচন করেন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ওষুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যায়াম, ধ্যান, ম্যাসাজ করা দরকার এবং এই রোগের জন্য মনে যদি অবসাদ আসে তবে কাউন্সেলিং করা প্রয়োজন। আর চটকদারি বিজ্ঞাপনে মোহিত না হয়ে বাজারচলতি ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

(যোগাযোগ—৯১৬৩২৬৮৬১৬)

কর্মযোগী যুগল কিশোর জৈথলিয়ার জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১ জুন সকালে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রাক্তন সভাপতি এবং স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের অন্যতম প্রবীণ ট্রাস্টী যুগল কিশোর জৈথলিয়া পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। গত দেড় বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। এক পুত্র ও তিন কন্যা-সহ আত্মীয়-পরিজন তথা বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, গোয়ার রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহা এবং ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ভি ভাগাইয়া প্রেরিত এক শোকবার্তায় বলেছেন, সঙ্ঘ পরিবারের সকলের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। তিনি আজীবন স্বয়ংসেবক ছিলেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের বিষয়ে অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর ভাষণগুলি নিয়ে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা তথা জাতীয় জীবনে একটি স্মারক চিহ্ন হয়ে থাকবে। তাঁর সাংগঠনিক নিপুণতা ছিল লক্ষ্যণীয়। তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

রাজস্থানের নাগৌর জেলায় ছোটিখাটু গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। ১৯৩৭ সালের ২ অক্টোবর তাঁর জন্ম। কলকাতায় ৪২নং কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের বাড়িতে থেকেই তাঁর শিক্ষালাভ ও বড় হয়ে উঠা। এম কম ও এলএলবি পাশ করে তিনি আইন ব্যবসায়কেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সাহিত্য সমাজসেবা ও রাজনীতিতেই তাঁর রুচি ছিল। তিনি কয়েকটি গ্রন্থের এবং প্রায় পঞ্চাশটি স্মারক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পেয়েছেন সম্মান তথা সংবর্ধনা। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান ও বিবেকানন্দ সেবা সম্মান প্রদানের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি।

তাঁর ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে 'কর্মযোগ কা পথিক' নামে এক অভিনন্দন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে স্বামী সত্যমিত্রানন্দজী, ধর্মেন্দ্রজী মহারাজ, অশোক সিংঘল, লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশী-সহ সমাজের সর্বস্তরের বহু বিশিষ্টজন তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

গত ৭ জুন মহাজাতি সদনের সভাগৃহে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তরুণ বিজয়, সাংসদ বিবেক গুপ্তা-সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। স্বস্তিকা প্রকাশন ট্রাস্ট-সহ কলকাতা মহানগরের ১৫০টি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, শৈক্ষণিক, আধ্যাত্মিক সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পণ করা হয়।

কলকাতায় মহাজাতি সদনে আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন তরুণ বিজয়।

উত্তরবঙ্গ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

গত ৫ জুন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ে শুরু হয়। প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে বর্গের শুভারম্ভ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ (রায়গঞ্জ নিবাসী) জহর পুরকায়স্থ তাঁর ভাষণে বলেন, সঙ্ঘের এই প্রথম বর্ষ শিক্ষা কেবলমাত্র ডিগ্রিলাভ করা নয়। প্রকৃত মানুষ হতে হবে সেজন্য এখানে শিক্ষাগ্রহণ, যার ফলে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ভারত গড়ার স্বপ্ন রূপায়িত হতে পারে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা প্রান্ত সঙ্ঘচালক বলেন, এখানে খোলা মনে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এদেশের গৌরবময় পরম্পরা ও স্বর্ণিম ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে। হিন্দুরাই এদেশে রাষ্ট্রীয়, এদেশের ইতিহাস হিন্দুদের ইতিহাস। এখানে আগত শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও বৌদ্ধিক শিক্ষা সার্বিকভাবে উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে স্বয়ংসেবকত্বের বিকাশ হবে। এই শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বয়ংসেবকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুটিত হবে। যা আগামীদিনে এই প্রদেশের সঙ্ঘকাজ বিস্তারে সহায়ক হবে। তিনি বর্গ পরিচালনার জন্য কয়েকজন কার্যকর্তার নাম ও দায়িত্ব ঘোষণা করেন— বর্গাধিকারী— শ্রীধর কোঁয়ার (প্রান্ত গ্রামবিকাশ প্রমুখ), মুখ্যশিক্ষক— চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (প্রান্ত ঘোষ প্রমুখ), বর্গ কার্যবাহ— রাজবলী পাল (দিনাজপুর বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ) এবং পালক অধিকারী— (প্রান্ত সেবা প্রমুখ) অজিত কুমার পাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রান্তকার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী।

মালদহে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিক্ষাবর্গ

গত ৪ জুন মালদা জেলায় লালপুর বোদরা প্রোজেক্টে গত ৪ জুন দশদিন ব্যাপী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিক্ষা বর্গ শুরু হয়। ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে বর্গের উদ্বোধন করেন পরিষদের উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার। শিক্ষার্থীদের সামনে তিনি এই শিক্ষা বর্গের মূল ভাবটি ব্যক্ত করেন। এই বর্গে ৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জন হলো মা ও বোন। শ্রী সরকার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি ভিএইচপি-র সাংগঠনিক কাজকে রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। যাতে বিশ্বের প্রাচীন হিন্দু জাতি তার গৌরবজনক অতীতকে নিয়ে টিকে থাকতে পারে।

শ্রদ্ধার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২২ মে সিউড়ী প্রণবানন্দ পল্লীর মিত্রভবনে ৮৭ বছর বয়স্ক সুনীল কুমার মিত্রকে শ্রদ্ধার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। তিনবার ওঁ ধ্বনি ও শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও মন্ত্র সহ প্রদীপ প্রজ্বলন দ্বারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি রুনু নায়ক। শ্রী মিত্রের হস্তপদ ধৌত করে পূজন করেন তাঁর বৌমা শ্রীমতী শাশ্বতী মিত্র। শ্রীমতিকে মাল্যদান করেন শ্রদ্ধার অনুদানী ও লিজক্লাবের সম্পাদক জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধার হিসাব পরীক্ষক ও অনুদানী পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রী মিত্রকে অর্ঘ্যস্বরূপ উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল, মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। মিত্র পরিবারের পক্ষে ডাঃ অভিজিৎ মিত্র বলেন, শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান এক অভিনব অনুষ্ঠান। বর্তমানে অভিজিৎ মিত্র নাগাল্যান্ডে দিমাপুরে থাকেন, মা, বাবা ও পরিবারের সঙ্গে। তিনি বলেন, আপনাদের অনেক সংগঠনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার। সবশেষে ‘ভবসাগর তারণ কারণ হে’ গানটি সমবেত পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দুর্গাপুরে সেবাভবনের ভূমিপূজন’ অনুষ্ঠান

গত ৯ ফেব্রুয়ারী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দুর্গাপুর সেবা বিভাগের উদ্যোগে ইছাপুর গ্রামে ‘সেবা ভবন’ নির্মাণের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেবা প্রকল্পের ছাত্রছাত্রী ও দাদাভাই- দিদিভাইদের যৌথ প্রচেষ্টায় বিপুল উৎসাহে প্রায় ৫০০ জনের উপস্থিতিতে ভূমিপূজন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ কাঠা জমির উপর দ্বিতল ভবন নির্মাণে রাউন্ড টেবল নামে একটি সংস্থা সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়ায় এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত সংস্থার ১৫ জনের একটি দল কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে এবং যজ্ঞের শিখায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের নির্মাণ হয় এবং শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উপস্থিতি কার্যক্রমের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। প্রান্ত সেবা প্রমুখ, নগর সংঘচালক এবং সমাজ সেবা ভারতীর সংগঠন সম্পাদক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আগামী দুর্গাপূজার সময় নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংগঠন সম্পাদক।

গঙ্গাজলঘাটি শিশুমন্দিরে সংস্কৃত কর্মশালা

গঙ্গাজলঘাটি কৌশিক স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দির বাঁকুড়া জেলার একটি অগ্রগণ্য শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই শিশুমন্দির শিশুর শিক্ষাকে আরও সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়িত চিন্তা ভাবনা করে চলেছে। এই চিন্তাভাবনারই ফসল হলো শিশুদের অভিভাবক/ অভিভাবিকাদের জন্য শ্রেণী অনুসারে বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুসারেই গত ২৯ মে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সংস্কৃত ভাষার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় শিশু মন্দিরে। প্রায় ৫০ জন শিশুর মোট ৭৫ জন অভিভাবকের অংশগ্রহণে সকাল আটটায় দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কর্মশালার সূচনা করেন সহ-সভাপতি নির্মলকুমার সিংহ। কাপিস্টা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতির উপর আলোচনা করেন আচার্যা মুনমুন মাজী ও সঙ্গীতা কুণ্ডু। অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করেন প্রধান আচার্য শংকরপ্রিয় সিংহ। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও আগ্রহোদ্দীপক। কর্মশালার সাফল্য সূচিত করে অংশগ্রহণকারীরা জানান যে, এরপর থেকে তাঁরা নিজেদের শিশুকে নিজেরাই সংস্কৃত পঠনে সাহায্য করতে পারবেন।

পরবর্তীকালে বৈদিক গণিত ও ইংরাজি বিষয়ের উপর কর্মশালা করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। শিশুমন্দিরের অন্যতম শিক্ষা-উপদেষ্টা প্রণব কর্মকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক সত্যপ্রিয় সিংহ।

মঙ্গলনিধি

গত ২৯ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার চাঁচল নগরের স্বয়ংসেবক জগন্নাথ দাস ও তাঁর সহধর্মিনী মহামায়া কুণ্ড দাস তাঁদের বড় কন্যা জয়িতা দাসের শুভ বিবাহ উপলক্ষে বিবাহ মণ্ডপে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদারের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাত, প্রান্ত সহ-সেবাপ্রমুখ গৌতম মণ্ডল, মালদা বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডল-সহ চাঁচলের বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। শ্রী মজুমদার মঙ্গলনিধি সেবাকাজের জন্য চাঁচল সেবা ভারতীর তহবিলে প্রদান করেন।

* * *

গত ৮ মে রবিবার বর্ধমান জেলার জামালপুর মহকুমার প্রাক্তন কার্যবাহ নিত্যানন্দ হালদার তাঁর একমাত্র পুত্র রাজু হালদারের শুভ বিবাহের আশীর্বাদ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত অর্থ দক্ষিণবঙ্গের কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্রের হাতে সমর্পণ করেন বাস্তুহারা সমিতির সেবা কাজের জন্য। উক্ত অনুষ্ঠানে সঙ্ঘ পরিবারের একাধিক প্রান্ত কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে তিনি ইজরায়েলে আমন্ত্রিত অধ্যাপনায় রত।

শোকসংবাদ

প্রবীণ স্বয়ংসেবক এবং বর্তমানে সংস্কার ভারতীর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কমল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ৫ জুন দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। স্ত্রীকে রেখে গেছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ১৯৮৮ সাল থেকে সংস্কার ভারতী বাংলার কাজে ব্রতী হন। সংস্কার ভারতীর প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন।

* * *

ঝাড়গ্রাম শহরের স্বয়ংসেবক তথা মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের ঝাড়গ্রাম আশ্রম ছাত্রাবাস সমিতির সদস্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের, ঝাড়গ্রাম জেলা সমিতির সদস্য মুকেশ প্রসাদের পিতা শ্রীরামগরিব প্রসাদ ৭৪ বৎসর বয়সে স্বল্প রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, পুত্রবধূ, ২ কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

ঝাড়গ্রাম শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক গৌরাঙ্গ পাত্র গত ১৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। তিনি মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের ঝাড়গ্রাম আশ্রম ছাত্রাবাস সমিতির দীর্ঘদিন সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগের আধিকারিক ছিলেন। তিনি সঙ্ঘেরও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা, ২ জামাই ও ১ নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাকপুর জেলার বেলঘরিয়া নগরের যতীনদাস শাখার স্বয়ংসেবক ঝন্টু সিংহ গত ৮ মার্চ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি মা, দাদা ও ১ ভাই রেখে গেছেন। তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার কার্যকর্তা ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর চোখ দুটি দান করে গেছেন।

হারানো দিনের মায়াবিজড়িত চলচ্চিত্র

সিনেমাওয়ালা

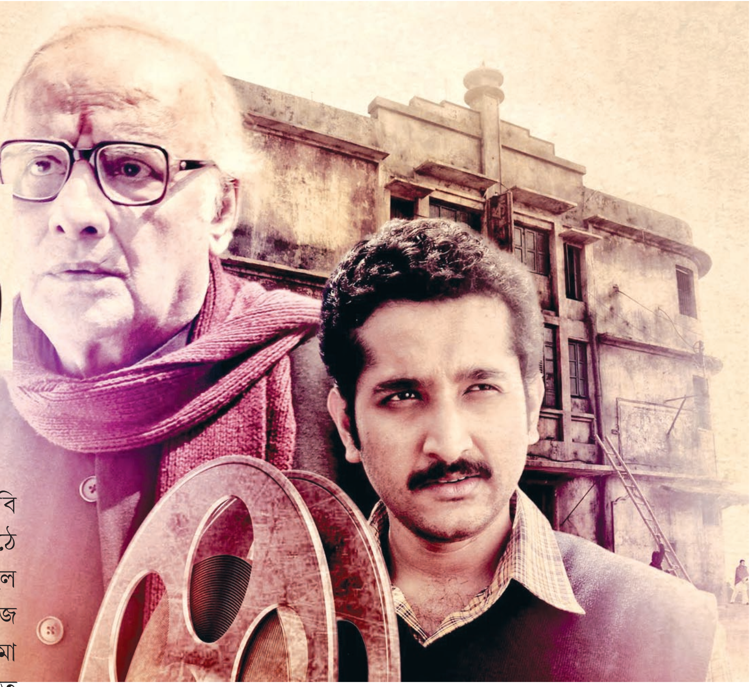

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কৌশিক গাঙ্গুলীর সাম্প্রতিকতম ছবি 'সিনেমাওয়ালা'র সমাপ্তি মুহূর্তে সাদা পর্দায় ফুটে ওঠে দু' লাইনের একটি শোকবার্তা, 'আগে বাংলায় চালু ছিল ৭০০টি একটিমাত্র চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর প্রেক্ষাগৃহ। আজ যার সংখ্যা মাত্র ২৫০টি'। এই বিলয়ের পথে বহু সিনেমা কর্মী, বিশেষ করে প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত তাঁরা জীবিকা হারিয়েছেন। এ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র অনায়াসেই বানানো যেত। কিন্তু কৌশিকবাবুর অভিষ্ট ছিল সৃষ্টি। কারণ তিনি তাঁর 'সিনেমাওয়ালা' ছবিতে ধরতে চেয়েছেন ৫০ থেকে ৮০ দশকের সময়সীমায় হলে হলে তুমুল আলোড়নতোলা বাংলা ছবির আজ বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলির সঙ্গে কীভাবে নিজেদের অঙ্গাঙ্গি করে ফেলেছিলেন কিছু মানুষ। এদেরই একজন 'কমলিনী' নামের একটি মফস্‌সল প্রেক্ষাগৃহের মালিক প্রণবেন্দু দাস। সঙ্গী তার আজীবন দোসর হরি। সিনেমাহলের ওপরতলার ব্যালকনির আসনগুলির মধ্যপথ দিয়ে যখন প্রোজেক্টারের আলোয় বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাগুলি ঝিকমিক করে উঠত, সৃষ্টি হোত এক অলীক নক্ষত্রপুঞ্জের গতিপথ। এই আলোই প্রলম্বিত হয়ে আছড়ে পড়ত পর্দায়। সৃষ্টি হোত কল্পনালোক। সারিবদ্ধ দর্শকবৃন্দ কখনও হর্ষে কখনও সিনেমার কুশীলবদের বেদনায় বিদ্ধ হয়ে অশ্রুপাত করতেন। এমন ঘটনা ছিল আকছার। প্রণবেন্দু রূপী পরান বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরির ভূমিকায় অরুণ গুহঠাকুরতা বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে অভিনয়কৃতির এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন রেখে গেলেন। প্রণবেন্দুর সঙ্গে তাঁর ছেলে প্রকাশের (পরমব্রত) তীব্র বিরোধ বাঁধে জাল সিডি প্রদর্শনের ব্যবসা চালানোর কারণে। কিন্তু সময়ের অমোঘ নিয়মকে মানতে চাননি প্রণবেন্দু। নিত্যদিন বন্ধ হয়ে থাকা সিনেমা হলের উপরের অফিরঘরটিতে বসে হারানো দিনের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। সহচর হরিকে যে দৃশ্যে তিনি বলছেন, 'দেখ ঠিক যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন উত্তম কুমার, সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা এক রাজপুত্তুর'। নেপথ্যে শোনা যায় নায়ক ছবির সংলাপ। এমন বহু দৃশ্যে সৃষ্টি উৎকর্ষের মাত্রা ছুঁয়ে যান কৌশিক। অথচ নিত্য মদ্যপানরত পরান ও প্রজেক্টর অপারেটর হরির অনায়াস সুযোগ ছিল মাতলামোতে ছবিটিকে ভরিয়ে দেওয়ার। পরিবর্তে একগুঁয়ে কিন্তু নীতিনিষ্ঠ পরান ছবির শেষদিকে পরিতাপ করেন যে রক্তের টান মানুষ এড়াতে পারে না। ছেলে সেই সিনেমাওয়ালাই হলো কিন্তু 'ফ্রড' সিনেমাওলা। তাঁর সহচর হরিকে উদ্দেশ্য করে এই 'রক্ত রক্ত' উচ্চারণে দূর অতীত থেকে ভেসে আসে অবিস্মরণীয় ছবি বিশ্বাসের জলসাঘরীয় স্মৃতি। আবার প্রাণসম বিলিতি প্রজেক্টরটিকে লোহার দামে ঢালাইওয়ালারা যখন ঠেলায় চাপায়, মনে হয় পরান ও হরির কোনো নিকট আত্মজের অন্তিযাত্রা শুরু হলো। এ দৃশ্য দেখতে পারেননি পরান। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক ছবির মানুষ ও যন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুষঙ্গটি অসাধারণ মুন্সীয়ানায় তুলে আনেন পরিচালক। হরি আসন্ন ধ্বংসের তীব্র মনোবেদনায় প্রজেক্টর রুমেই আত্মহত্যা করে। 'কমলিনী' হলটি ছিল বিবাহবিচ্ছিন্ন পরানের স্ত্রীর নামে। যিনি এক জায়গায় ছেলে পরমব্রতকে বলছেন, 'বাবার মতো যেন বৌয়ের নামে তাজমহল গড়ে বউকেই ভুলে যেও না।' পরিষ্কার হয়ে যায় পরানের সিনেমাপ্রেম। শেষ দৃশ্যে চরম অভিমান অনুতাপ, বন্ধু বিয়োগের ব্যথায় বিধ্বস্ত কিন্তু আপোশহীন পরান হলে আগুন ধরিয়ে দেন। অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত সঙ্গীতের অভিঘাতের সঙ্গে লুপ্ত হতে থাকে অন্ধকার অপরিসর সিনেমা হলে উত্তমকুমার, সুচিত্রা, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, ছায়াদেবীদের মতো চিরস্মরণীয়দের সহযাত্রী হয়ে বাঙালির একটি কালপর্বের রুপালি পর্দায় মায়াবী ভ্রমণ কাহিনি।

তবে গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিতের টেপ, সেলুলয়েড সিডির পর ডিভিডির মতো প্রযুক্তির বিবর্তন চলতে থাকবেই, কিন্তু কৌশিকবাবু হারানো দিনের যে মায়া ও সেই সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা মানুষজনকে এই ছবিতে আটক করে গেলেন তা সেলুলয়েড যুগের পরও এক অমলিন শ্রদ্ধার্ঘ্য হয়ে থাকবে। আর হ্যাঁ, পরমের স্ত্রীর ভূমিকায় সোহিনী সরকার বাংলা ছবিতে এক সম্পদ হয়ে উঠবেন। ছবিটি ছবিঘরে গিয়ে দেখার অনুরোধ রাখা কর্তব্য। ■

শব্দরূপ-৭৯১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১		২	৩	■	৪	
৫		■	৬		■		■
৭		■	■		■		■
■		■	৮		৯		১০
১১		■	■	১২		■	
	■	১৩	■	■	■	■	■
■	১৪			১৫		■	১৬
■	■		■		■	■	

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** নতুন বছরের হিসাবের খাতা, **৪.** নীলকান্ত মণি, **৫.** বায়ু; রোগবিশেষ, **৬.** বলয়াকার পায়ের গহনা; বিষ্ঠা, **৭.** 'এতটুকু— করেছিনু আশা' (রবীন্দ্রনাথ), **৮.** ঘোমটা, **১১.** সরিষায় শ্রীরাধিকা, **১২.** বিষ্ণুর প্রথম অবতার, **১৪.** লাভের বা পারিশ্রমিকের তুলনায় অতিরিক্ত খাটুনি।

উপর-নীচ : **১.** ম্যাজিকে লাগে, চুরিতেও, **২.** লেফাফা, **৩.** ভাদ্র মাসের শুক্লানবমী যে তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে তালফল দান ঘটিত ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, **৪.** শিব; পক্ষীবিশেষ, **৫.** জনক, **৯.** চট, চটের থলি, **১০.** শিবের অনুচর, **১১.** রাজপুত রাজার উপাধি ('চিতোরের —'), **১৩.** বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত একপ্রকার সাংগীতিক উৎসব, **১৫.** পল্লী, পাড়া ('কুমোর —'), **১৬.** বৈষ্ণবের তুলসীমালা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮৮
সঠিক উত্তরদাতা
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

■	■	লা	খ	বা	ন	■	গো
আ	কা	ল	■	■	র	■	কু
■	লা	■	কা	■	ক	পা	ল
■	পা	চী	ল	■	■	গ	■
■	হা	■	■	হা	সি	ল	■
ক	ড়	চা	■	ট	■	পা	■
ণা	■	ল	■	■	আ	রা	ধ্য
দ	■	শে	ষ	শা	য়ী	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৯১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ জুলাই ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তা সমগ্র জীবন ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তার দৃষ্টিকোণ হলো একাত্ম। টুকরো-টাকরাতে বিচার করা বিশেষজ্ঞদের বলা হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তা উপযুক্ত নয়। পাশ্চাত্যের সমস্যার মূল কারণ জীবনকে টুকরো টুকরো রূপে দেখে এবং তাপ্পি লাগিয়ে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বিচার করতেই হবে। কেননা তা আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি। স্বরাজ্যের সঙ্গে স্ব-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতির ভাবনা না থাকলে স্বরাজ্যের জন্য লড়াই স্বার্থপর ও পদলোলুপ লোকেদের রাজনৈতিক লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়ে যাবে। স্বরাজ্য তখনই সাকার ও সার্থক হবে যখন তা নিজ সংস্কৃতির উপকরণে পরিণত হবে। এতে আমাদের বিকাশ হবে এবং আমরা আনন্দের অনুভূতি লাভ করবো।

প্রশ্ন তোলা হয়, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম অধ্যাত্মপ্রধান হওয়ায় তা জীবনের সমস্যার প্রতি উদাসীন। তাই আর্থিক সমাধানের জন্য পাশ্চাত্যের দিকে তাকাতে হবে— এই ভ্রান্তি দুষ্প্রচার এবং আধ্যাত্মিকতার ভুল ব্যাখ্যার পরিণাম। সত্য কথা হলো, আমাদের ধর্ম সমগ্র পার্থিব জগতের ভাবনা নিয়েই চলে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে— 'যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্মঃ', অর্থাৎ যাতে ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতি হয় তাই ধর্ম। ইহলোক বাদ দিয়ে পরলোকের ভাবনা হয় না। ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতা পরস্পর প্রশ্নের দিক নির্দেশ করে। আধ্যাত্মিকতাকে যদি সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়, তা বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভারতবর্ষ শুধু আধ্যাত্মিক নয়, ভৌতিক জগতে অর্থেরও ভাবনা ভেবেছে। চাণক্য বলেছেন— 'সুখস্য মূল ধর্মঃ, ধর্মস্য মূলং অর্থঃ।' সুখ ধর্মমূলক এবং ধর্ম অর্থমূলক। অর্থ ব্যতীত ধর্ম নয়।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

With Best

Compliments

from -

A

Well Wisher

B.M.

নিউ জারসির স্কুলে হিন্দু পুজোপার্বণে ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমেরিকার নিউ জারসির স্টেট বোর্ড অব এডুকেশন সম্প্রতি তাদের অধীনস্থ স্কুলগুলিতে ধর্মীয় উৎসব বা পুজোপার্বণে ছুটির তালিকা প্রস্তুত করেছে। এই তালিকায় স্থান পেয়েছে উনিশটি হিন্দু উৎসব। এর মধ্যে রয়েছে : নবরাত্রি, গুরু পূর্ণিমা, নাগ পঞ্চমী, রাখি বন্ধন, জন্মাষ্টমী, গণেশচতুর্থী, ওনাম, দসেরা, দিওয়ালি, গোবর্ধন পুজো, মকরসংক্রান্তি, পোঙ্গল, বসন্তপঞ্চমী, শিবরাত্রি, হোলি, চন্দ্রামানা যুগাদি, সৌরমানা যুগাদি, রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তী। ইউনিভার্সাল সোসাইটি অব হিন্দুইজম-এর মুখপাত্র রঞ্জন জেড এই ঘটনাকে একটি সদর্থক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুধর্মে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকে। প্রত্যেকটি পরিবার চায় বাড়ির স্কুল পড়ুয়া ছেলেটি যেন বাড়িতে থেকে উৎসবের দিনে আনন্দ করতে পারে। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে তাই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।' বোর্ডের তরফ থেকে বলা হয়েছে, তালিকাভুক্ত উৎসবের দিনগুলিতে কোনো ছাত্র স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে তাকে কোনোভাবেই বকাঝকা করা যাবে না। এমনকী পরীক্ষার দিন অনুপস্থিত থাকলেও তাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে।

নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের ফেসবুক পেজে দু' লক্ষ লাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরকারি কাজে সোশাল মিডিয়ার পর্যাপ্ত ব্যবহারের যে নীতি মোদী সরকার গ্রহণ করেছে তা ইতিমধ্যেই দেশেবিদেশে প্রশংসিত। সম্প্রতি নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের ফেসবুক পেজে ২ লক্ষ লাইক বিষয়টিকে নিছক প্রশংসার জায়গায় না রেখে একেবারে অবাধ সমর্থনের জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। জানা গেছে ২ লক্ষের মধ্যে ১ লক্ষ লাইক এসেছে মাত্র পাঁচ মাসে। কী আছে এই ফেসবুক পেজে? বিভাগীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধী জানিয়েছেন এটিই মন্ত্রকের সরকারি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। সাধারণত মন্ত্রকের কর্মসূচি পেজে পোস্ট করা হয়। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় ও তাদের সমস্যার সমাধান করা। শ্রীমতি গান্ধী জানিয়েছেন তিনি নিজে বহু মানুষের সঙ্গে লাইভ চ্যাট-এ অংশ নিয়েছেন। ফেসবুকের মাধ্যমে প্রায় ১৬০০ প্রশ্ন পাওয়া গেছে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ফেসবুক ছাড়া টুইটার এবং অন্যান্য সোশাল মিডিয়াতেও মন্ত্রক তার প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার রোধে সরকার কী ভাবছে সেই সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

অসমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পুরোটাই সিল করে দেবার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর উপস্থিতিতে সীমান্ত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মন্ত্রীরা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিব সুশীলকুমার এবং সীমান্ত সুরক্ষা সেবার আধিকারিকরা। সীমান্ত সুরক্ষা প্রসঙ্গে সরকারের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, অসমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পুরোটাই সিল করে দেবার কথা কেন্দ্র এবং অসমে নবনিযুক্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার উভয়ের ভাবনায় রয়েছে। এর জন্য অসমে বিএসএফ-এর শক্তি ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা হবে। এখনও পর্যন্ত ২২৩.৭ কিলোমিটার অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সীমান্তবর্তী ১২২টি জায়গায় কোনো 'ফিজিকাল ব্যারিয়ার' অর্থাৎ সেনাপ্রহরা নেই। এইসব অঞ্চলই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চল বলে অভিযোগ। জানা গেছে, ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত পুরোপুরি সিল করার লক্ষ্যে এরকম আরও ১০০টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে— যার জন্য ১১.৯ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া রয়েছে ৪৮.৮ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে আরও ২২টি অবাধ মুক্তাঞ্চল। সমস্যা হলো এই ৪৮.৮ কিলোমিটার জায়গা নদী সংলগ্ন। প্রাচীর দেবার উপায় নেই। তাই এখানে গড়ে তোলা হবে 'নন ফিজিকাল ব্যারিয়ার' অর্থাৎ প্রযুক্তিভিত্তিক সুরক্ষা পরিকাঠামো। কী ধরনের যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে সে কথাও জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হাই রেজলিউশন ক্যামেরা, র‍্যাডার, গ্রাউন্ড সেন্সর, অপটিকাল ফাইবার, ইনফ্রারেড সেন্সর, অ্যারোস্টাটস, থার্মাল ইমেজারস ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। তৈরি করা হবে বাড়তি চেকপোস্টও।

ডাকযোগে প্রসাদ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গঙ্গাজলের পর এবার প্রসাদ! ভক্তরা চাইলে এখন থেকে মথুরা এবং বৃন্দাবনের বিভিন্ন মন্দিরের প্রসাদ বাড়িতে বসে পেয়ে যাবেন। ডাকবিভাগ বিতরণ করবে প্রসাদ। জানা গেছে, বাঁকেবিহারী, রাধারানি, দ্বারকাধীশ এবং কৃষ্ণজন্মস্থান মন্দিরের প্রসাদ পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ডাকযোগে গঙ্গাজল বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন আপাতত প্রসাদ বিতরণ পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এবং এন সি আর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে। আগ্রা ডিভিশনের পোস্ট মাস্টার জেনারেল মনীষা সিনহা জানালেন এই সুবিধা মথুরা, আগ্রা, মইনপুরী, ঝাঁসি, আলিগড়, বুলন্দশহর, এটাওয়াটা জেলায় পাওয়া যাবে। দিনের দিন ডেলিভারির সুবিধা পাওয়া যাবে শুধু মথুরা ও আগ্রা জেলায়। অন্যত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। কৃষ্ণজন্মস্থান দ্বারকাধীশ এবং বাঁকেবিহারী মন্দিরে ওয়াই-ফাই সার্ভিসও চালু করতে চলেছে সরকার।

এক মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রকের একটি সূত্র। ডাকযোগে প্রসাদ বিতরণের প্রকল্প সফল হলে অদূর ভবিষ্যতে টেলিফোন এবং অনলাইনেও এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে খবরে প্রকাশ।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
13 June - 2016 - Rs. 10.00